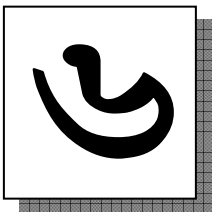

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যদিও পলাশীর যুদ্ধের পর পরই রাজ্য স্থাপনে সক্ষম ছিল, কিন্তু নানা বাস্তব অসুবিধা, রাজস্ব প্রশাসনে অনভিজ্ঞতার কারণে নিজেদের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় প্রথম দিকে বিরত থাকে। ১৭৬৫-১৭৭২ সময়কালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মুঘল রাজস্ব কর্মকর্তা রেজা খান ও সিতাব রায়ের সহায়তায় দ্বৈত শাসন পরিচালনা করে। কিন্তু গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হাতে তুলে নেন। এভাবে হেস্টিংস ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল স্থাপন করেন। আর এই ভিত্তির ওপর কর্নওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকে স্থায়ী রূপ দেন।এই পর্যায়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশীয় নরপতিগণ প্রতিরোধ গড়ে তুলেন বিশেষ করে মহীশূরে টিপু সুলতানের ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ ছিল উল্লেখযোগ্য। কর্নওয়ালিস এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ওয়েলেসলি কূটকৌশল ও রণনৈপুণ্যে টিপু সুলতানকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। ওয়েলেসলি আক্রমণাত্মক ও সাম্রাজ্যবাদী 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' প্রয়োগ করে ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হন।ওয়েলেসলির পর উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভারতে আসেন।একজন হিতবাদী শাসক হিসেবে ভারতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, নিষ্ঠুর ও অমানবিক ধর্মীয় প্রথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে বেন্টিঙ্ক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। বেন্টিঙ্ক পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ডালহৌসি যুদ্ধ ও স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য দখল করেন। এভাবে রাজ্য দখল, লুণ্ঠন এবং নির্মম শোষণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ভারতবর্ষে সংঘটিত হয় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ। আলোচ্য ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে এসব বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. ওয়ারেন হেস্টিংস
- পাঠ-২. লর্ড কর্নওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
- পাঠ-৩. টিপু সুলতান ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ
- পাঠ-৪. লর্ড ওয়েলেসলি ও অধীনতামূলক মিত্রতা
- পাঠ-৫. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঃ সংস্কারসমূহ
- পাঠ-৫. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঃ সংস্কারসমূহ
- পাঠ-৬. লর্ড ডালহৌসি
- পাঠ-৭. ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ

পাঠ - ১

ওয়ারেন হেস্টিংস

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *ওয়ারেন হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ নীতি যেমন রাজস্ব ও বিচার সংক্রান্ত সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;*
- *হেস্টিংসের শাসনকালের একটি মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

আঠার শতকের সত্তরের দশকে ভারতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ইংরেজদেরকে মারাঠা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর এই তিন শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অন্যদিকে পশ্চিম গোলার্ধে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। যেমন ফরাসি বিপ্লবোত্তর সমস্যা, স্পেনের যুদ্ধ এবং আমেরিকান উপনিবেশগুলোর সম্মিলিত বিদ্রোহ ইত্যাদি। পুরাতন শত্রুর বিপদ দেখে ভারতে ফরাসি শক্তি ইংরেজদের আঘাত করার যে প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেটাও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির এই দুর্দিনে বুদ্ধিমান, উদ্যোগী, অভিজ্ঞ ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত হন এবং ইংরেজদের বিলীয়মান শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং ভারতের অভিজাতবর্গের ওপর নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছিল। এজন্যে তাঁকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইম্পীচ (বিচার) করে।

১. হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ নীতি

হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নর হলেন তখন চারিদিকে অরাজক ও বিশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করছিল। তাঁর পূর্বসূরী ক্লাইভ-এর দ্বৈত শাসনের ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং রাজকোষও শূন্য হয়ে পড়ে। কোম্পানির দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের অত্যাচারে বাংলার জনগণ সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। এই বিপদজনক পরিস্থিতিতে তিনি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল।

(ক) রাজস্ব সংস্কার

১৭৭২ খ্রি. হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হাতে ন্যস্ত করেন। ১৭৬৫ খ্রি. দিওয়ানী লাভের পর দিওয়ানী পরিচালনার আইনগত অধিকার ছিল কোম্পানির।

কিন্তু বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল নায়েব দেওয়ান মুহাম্মদ রেজা খানের ওপর এবং বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল নায়েব দেওয়ান সীতাব রায়ের ওপর। কোম্পানির ডাইরেক্টররা নায়েব ও দিওয়ানদের সততায় বিশ্বাস করতেন না এবং তাদের ধারণা হয়েছিল যে, এরা রাজস্ব আত্মসাৎ করে ফেলে। এজন্যে হেস্টিংস প্রচলিত ব্যবস্থার অবসান করে রেজা খান ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করেন। তিনি দুর্নীতির অভিযোগে তাদের বিচারের আয়োজন করেন। তবে তারা নির্দোষ প্রমাণিত হন। তিনি রাজকোষের অবস্থা উন্নতির জন্যে নবাবের বাৎসরিক ভাতা ৩২ লক্ষ থেকে অর্ধেকে নামিয়ে ১৬ লক্ষ টাকায় স্থির করেন। হেস্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তার করা।

হেস্টিংস রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্যে একটি ক্ষুদ্র ভ্রাম্যমান কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সদস্যরা প্রত্যেক জেলায় উপস্থিত হয়ে জমিদারদের সাথে সরাসরি বন্দোবস্ত করতেন। জমিদারদের সাথে পাঁচ বছরের জন্যে বন্দোবস্ত করা হল। কোম্পানির রাজস্ব আদায়কারীকে বলা হতো সুপারভাইজার। হেস্টিংস তাদের নাম বদল করে তাদেরকে কালেক্টর নামকরণ করেন। রাজস্ব কোষাগারকে মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় স্থানান্তর করা হয়। গভর্নর এবং তার কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে রাজস্ব বোর্ড গঠন করা হয়। দিওয়ানী সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্ব এই বোর্ডের হাতে দেয়া হয়।

হেস্টিংসের রাজস্ব বিষয়ক নতুন নীতি তখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্যায়ে ছিল। নতুন নীতিতে সাফল্য এসেছিল খুবই কম। তাই দেখা যায় যে, ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাত্র এক বছর আগে গৃহীত জমি বন্দোবস্তের পদ্ধতি নিয়ে নবগঠিত রাজস্ব বোর্ড দীর্ঘ আলোচনা করেছিল। তখন ওয়ারেন হেস্টিংস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু স্বল্প সময়ে রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে বলে অস্থায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এই ব্যবস্থায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ছয়ভাগে ভাগ করে ছয়টি প্রাদেশিক কাউন্সিল গঠন করেন। প্রত্যেক কাউন্সিলের কাজে সাহায্যের জন্য একজন করে দেশীয় দেওয়ান নিয়োগ করা হয়। এই ব্যবস্থা যখন চালু হল তখন প্রতি জেলায় কালেক্টর পদ উঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এই পদক্ষেপ সমুচিত ছিল না। ১৭৭৬ খ্রি. হেস্টিংস আমিনি কমিশন গঠন করে রাজস্ব সংক্রান্ত বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং এই কমিশনের সুপারিশের পর প্রাদেশিক কাউন্সিল বাতিল করে পুনরায় কালেক্টরদের নিয়োগ করেছিলেন।

রাজস্ব সংস্কার ও জমিদারি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে হেস্টিংস যে অস্থিরতার পরিচয় দেন, তাতে জমিদারি ব্যবস্থার বহু বছরের ভিত্তি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। রাজস্ব আদায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু জমিদাররা পূর্বে বিদ্বান, ধর্মীয় নেতা প্রমুখকে ভূমিদান করে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজ করতেন, তা বন্ধ হয়ে যায়। রাজস্ব আদায়ই তখন একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

(খ) বিচার বিষয়ক সংস্কার

নবাবী আমলে রাজস্ব আদায় এবং ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত মামলার বিচার করতেন দেওয়ান এবং ফৌজদারি মামলার বিচার করতেন কাজী। ১৭৬৫ খ্রি. দিওয়ানী লাভের পর কোম্পানি দিওয়ানী মামলার বিচারের বিষয়টি নিজেদের হাতে নিল। কিন্তু ফৌজদারি বিচারের দায়িত্ব ছিল নবাবের নিযুক্ত কাজীর ওপর। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রি. বিচার বিভাগের প্রচলিত ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে সংস্কার সাধন করেন। তিনি প্রত্যেক জেলায় একটি করে দিওয়ানী ও ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। এগুলোর নতুন নামকরণ করা হল মফস্বল দিওয়ানী ও মফস্বল ফৌজদারি আদালত।

(গ) অন্যান্য সংস্কার

হেস্টিংস দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো কতিপয় সংস্কার সাধন করেন। প্রথমত, প্রত্যেক আদালতের মামলা সংক্রান্ত নথি সংরক্ষণ। দ্বিতীয়ত, বারো বছরের মধ্যে মামলা না করলে মামলা তামাদি হয়ে যাওয়া।

তৃতীয়ত, অত্যধিক পরিমাণ জরিমানা নিষিদ্ধ করা এবং সুদের হার নির্দিষ্ট করে দেওয়া ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করেন। বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি দুটো ঐতিহাসিক কাজ করেন। যেমন তিনি হিন্দু প্রজার কতিপয় বিচারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলিম প্রজার ক্ষেত্রে কোরআনের বিধিবিধান প্রয়োগের নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেন। দ্বিতীয়ত, বিচার প্রার্থীর কাছ থেকে কাজী এবং মুফতি বিচারের ব্যয় হিসেবে অর্থ গ্রহণ করতেন। হেস্টিংস এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে তাদের জন্যে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করেন।

২. হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতি

হেস্টিংস গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে দেখলেন যে, কোম্পানি ইতোমধ্যে বাংলায় বণিক সংঘ থেকে শাসক-রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যসমূহ এবং রাজনৈতিক শক্তির প্রতি সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। হেস্টিংসের সীমান্ত নীতি ছিল বাস্তবধর্মী এবং এক্ষেত্রে তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করেন। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে নতুন কোন অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত করেননি, তবে মোঘল সম্রাটের শক্তি খর্ব করেন এবং মারাঠা ও মহীশূরের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। অযোধ্যার নবাবকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করে ভবিষ্যত ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করে দেন। তার সীমান্ত বা পররাষ্ট্র নীতিকে তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায় ঃ (ক) মুঘল সম্রাটের সাথে সম্পর্ক, (খ) অযোধ্যা ও রোহিলাখন্ডের সাথে সম্পর্ক, ও (গ) পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে যথাক্রমে মারাঠা ও মহীশূর সম্পর্কিত সমস্যা।

(ক) হেস্টিংস ও মুঘল সম্রাট শাহ আলম

আঠার শতকের সত্তরের দশকে মারাঠারা দুর্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। ১৭৭১ খ্রি. তারা দিল্লি দখল করে এবং সেখানে শাহ আলমকে পুন:স্থাপন করে। শাহ আলম অযোধ্যার কারা এবং এলাহাবাদ জেলা মারাঠাদের প্রদান করেন। এ অবস্থায় হেস্টিংস দেখলেন যে, সম্রাট মারাঠাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিওয়ানীর জন্যে সম্রাটকে প্রতি বছর যে ২৬ লক্ষ টাকা দিত, তিনি তা বন্ধ করে দেন। তদুপরি হেস্টিংস ১৭৭৩ খ্রি. বানারসের সন্ধি দ্বারা অনেকটা অন্যায়ভাবে অযোধ্যার নবাবকে কারা এবং এলাহাবাদ প্রদান করেন। বিনিময়ে অযোধ্যার নবাব ইংরেজদেরকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করেন এবং নিজ ব্যয়ে অযোধ্যায় একদল ইংরেজ সৈন্য রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। ঠিক হয় যে, অযোধ্যার নবাব প্রয়োজনে ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। হেস্টিংস চেয়েছিলেন যে, অযোধ্যাকে মারাঠা এবং ইংরেজদের মধ্যবর্তী রাজ্য (Buffer state) হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই ছিল তার অযোধ্যা নীতির মূল লক্ষ্য।

(খ) রোহিলা যুদ্ধ

রোহিলাখন্ড ছিল হিমালয়ের পাদদেশে, অযোধ্যার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এক উর্বর ক্ষুদ্র রাজ্য। আফগান সরদার হাফিজ রহমত খাঁ ছিলেন এই রাজ্যের শাসক। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার লোলুপ দৃষ্টিতে পড়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি। মারাঠা আক্রমণ থেকে রোহিলা রাজ্যকে রক্ষা করার নামে সুজাউদ্দৌলা যখন রহমত খাঁর কাছে চল্লিশ লক্ষ টাকা দাবি করেন, তখন তিনি এই বিপুল পরিমাণ টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এমতাবস্থায় সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের কাছে সৈন্যবাহিনী প্রেরণের অনুরোধ করেন এবং তাদেরকে যুদ্ধের ব্যয় ছাড়াও অতিরিক্ত চল্লিশ লক্ষ টাকা প্রদানে সম্মত হলেন। কোম্পানির আর্থিক লাভের জন্যে হেস্টিংস ইংরেজ সেনা প্রেরণ করেন। ফলে যৌথ বাহিনীর হাতে রোহিলারা পরাজিত হয়, যুদ্ধক্ষেত্রে রহমত খাঁ নিহত হন এবং রোহিলাখন্ড অযোধ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। এজন্যে হেস্টিংসের তীব্র সমালোচনা করা হয়ে থাকে, কারণ তিনি ব্রিটিশ সৈন্যকে ভাড়াটিয়া হিসেবে ব্যবহার করে মানবিক ও নৈতিক অপরাধ করেছিলেন। কিন্তু এই সমালোচনা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কোম্পানির দরকার ছিল অর্থের, হেস্টিংস এই অর্থ পেয়েছিলেন।

তদুপরি তিনি তাঁর মিত্র রাজ্য অযোধ্যাকে শক্তিশালী করতে কৌশলগত কারণে রোহিলাখন্ড আক্রমণে সুজাউদ্দৌলাকে সহায়তা করেন।

(গ) হেস্টিংসের মারাঠা ও মহীশূর নীতি

১৭৭৯ খ্রি. দক্ষিণ ভারতের শক্তিগুলো যেমন হায়দ্রাবাদের নিজাম, মারাঠা এবং মহীশূর ইংরেজদের বিরুদ্ধে সামরিক সংঘ স্থাপন করে। হেস্টিংসের কূটনীতির ফলে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৭৮২ খ্রি. প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয় সালবাই চুক্তি দ্বারা। এর ফলে ইংরেজরা দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তির কাছ থেকে প্রায় কুড়ি বছর কোন প্রতিরোধ বা আক্রমণের সম্মুখীন হয়নি। হেস্টিংস গুন্টুর প্রদেশ নিজামকে ঘুষ হিসেবে প্রদান করে তাকে মিত্র হিসেবে পেয়ে যান। অন্যদিকে দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে অবসান হয়। হেস্টিংস হায়দার আলীর আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের সাথে চুক্তি সাক্ষর করে মিত্রতা স্থাপন করেন।

৩. হেস্টিংসের অনৈতিক কাজ ও ইম্পীচমেন্ট

কোম্পানির আর্থিক সংকট দূর করতে হেস্টিংস অবৈধ অর্থ গ্রহণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। রোহিলা নীতিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়াও রাজা চৈৎ সিং ও অযোধ্যার বেগমদের নির্যাতন করে অর্থ সংগ্রহ করেন। তিনি বিখ্যাত জমিদার নবকুমারকে ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন। এসব অনাচারের জন্যে তাকে পরবর্তীকালে ইম্পীচ করা হয়েছিল। তবে হেস্টিংস ভারতে ইংরেজ রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনি কোম্পানির শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন এবং সর্বোপরি কোম্পানির অর্থাভাব দূর করে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। অন্যদিকে ভারতীয়দের স্বার্থ, মর্যাদা, ন্যায়নীতি কিংবা মানবতার দিক থেকে দেখলে হেস্টিংস অনেক নিন্দনীয় কাজ করেছেন।

বাংলা তথা ভারতে তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি ভারতে আধুনিক বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি (Royal Asiatic Society) প্রতিষ্ঠা করেন তিনি।

সারসংক্ষেপ

আঠার শতকের সত্তরের দশকে ভারতে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। এ সময় বাংলার গভর্নর নিযুক্ত হন ওয়ারেন হেস্টিংস। তিনি কোম্পানির শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা স্থাপন করেন; পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সাফল্যঅর্জন এবংসর্বোপরি কোম্পানির অর্থাভাব দূর করে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু ভারতীয়দের স্বার্থ, মর্যাদা কিংবা ন্যায়নীতি মানবতার দিক থেকে দেখলে তিনি অনেক নিন্দনীয় কাজ করেছেন। দুর্নীতি এবং ভারতীয় অভিজাতদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে বৃটিশ পার্লামেন্ট তাকে ইম্পীচ করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*
২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*
৩. এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। হেস্টিংস রাজস্ব কোষাগারকে মুর্শিদাবাদ থেকে স্থানান্তর করেন–
(ক) ঢাকায় (খ) দিল্লিতে
(গ) কলিকাতায় (ঘ) রাজশাহীতে।

২। ১৭৭১ খ্রি. মারাঠারা দিল্লি দখল করে সেখানে যে মুঘল সম্রাটকে ক্ষমতায় বসায় তাঁর নাম–
(ক) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (খ) শাহ আলম
(গ) দ্বিতীয় আকবর (ঘ) শাহজাহান।

৩। রোহিলাখন্ডের অধিপতির নাম–
(ক) বিলায়েত খাঁ (খ) হাফিজ রহমত খাঁ
(গ) খোদা বক্স (ঘ) হায়দর আলী।

৪। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান হয় যে সন্ধি দ্বারা–
(ক) সালবাই চুক্তি (খ) দিল্লি চুক্তি
(গ) আলীনগরে চুক্তি (ঘ) কলিকাতা চুক্তি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। হেস্টিংসের সময় বাংলা ও বিহারের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব কোম্পানি কেন নিজ হাতে তুলে নেয়?

২। হেস্টিংসের বিচার সংক্রান্ত সংস্কার আলোচনা করুন।

৩। হেস্টিংসকে কেন ইম্পীচ করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। হেস্টিংসের অভ্যন্তরীণ নীতি পর্যালোচনা করুন।

২। হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতির একটি রূপরেখা অঙ্কন করুন।

৩। বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় হেস্টিংসের অবদান মূল্যায়ন করুন।

পাঠ - ২

লর্ড কর্নওয়ালিস ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পূর্ব বাংলা ও ভারতের ভূমি ব্যবস্থা এবং কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পটভূমি জানতে পারবেন;*
- *বাংলায় ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্নওয়ালিস ও জন শোরের বিতর্ক সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি দূর করতে বিভিন্ন আইন পাস হয়েছিল, সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

১৭৮৬ খ্রি. লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন। কর্নওয়ালিস ছিলেন একজন সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী গভর্নর জেনারেল। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে বিভিন্ন রকম সংস্কার কাজের জন্যে তিনি একজন আলোচিত ব্যক্তিত্ব। ভূমি ব্যবস্থায় তিনি যে যুগান্তকারী পরিবর্তন করেন তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছে।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তন পূর্ব ভূমি ব্যবস্থা

স্মরণাতীত কাল থেকে বাংলা তথা ভারতে কৃষিজাত শস্যের একটি অংশ ভূমি রাজস্ব হিসেবে রাজকোষে জমা দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। এটি আদায়ের নানা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ কর্মচারীরা সরাসরি কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করতেন। অনেকক্ষেত্রে মধ্যবর্তী কেউ এটি আদায় করতেন। এরা ছিলেন জমিদার, জোতদার বা অন্য কোন উপাধিধারী মধ্যস্বত্বভোগী। এরা নির্দিষ্ট কমিশন পেতেন। আবার তাদের নিজস্ব জমিদারীও ছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের ভিত্তিতে জমির ওপর ব্যক্তি মালিকানা কায়েম করে। এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ-পূর্ব ভূমি ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। রাজা বা নবাব এবং কৃষক সমাজের মধ্যবর্তী ছোট খাট শাসক, জমিদার, জায়গীরদার প্রমুখ মধ্যস্বত্বভোগী রাজস্ব সংগ্রাহকরা চাষীদের মতোই এদেশে ভূমির সাথে স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু এরা কেউ ভূমির সাথে চিরায়িত বন্ধনে যুক্ত কৃষককে জমি থেকে উৎখাত করতে পারতেন না। লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভূমির দলিল বা চুক্তিপত্রের অধিকারীর স্বার্থ রক্ষা করা ও ব্রিটিশ আইনের সম্পত্তির অধিকারের পবিত্রতা বজায় রাখার তাগিদে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ব্যবহার করে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় এবং ভারতে লক্ষ লক্ষ চাষীকে জমি ও জীবিকা অর্জনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তদুপরি এই বন্দোবস্ত এ অঞ্চলে ঐতিহ্যবাহী নির্ভরশীলতার রূপটিকে তছনছ করে দেয়।

চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পটভূমি

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্যে কর্নওয়ালিস একা দায়ী ছিলেন না। ১৭৭০ খ্রি. থেকে এ ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে নানা অভিমত গড়ে ওঠে এবং কর্নওয়ালিসের সময়ে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। ১৭৭০ খ্রি. স্কটিশ চিন্তাবিদ আলেকজান্ডার দাও (Alexander Dow) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। ১৭৭২ খ্রি. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিজ হাতে বাংলার দেওয়ানি তুলে নেয়। তখন থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আদায়ের জন্যে পাঁচ বছর মেয়াদে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এই পাঁচসনা ইজারাদারী ব্যবস্থার মেয়াদ শেষ হবার আগেই গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস পরবর্তীকালে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন। তিনি প্রাদেশিক রাজস্ব কাউন্সিলগুলোকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন এই ব্যবস্থার সাফল্য-ব্যর্থতা যাচাই করে পরবর্তী বন্দোবস্ত কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে তাদের মতামত পেশ করেন। দেখা যায় যে, প্রত্যেকটি প্রাদেশিক কাউন্সিল পাঁচসনা ইজারাদারী ব্যবস্থার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন। তারা পরিস্কারভাবে বললেন, নিলাম পদ্ধতিতে খাজনা আদায়ে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তারা আরো বলেন, জমিদারদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা প্রয়োজন এ কারণে যে, কোম্পানির পক্ষে সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব বা খাজনা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কারণ, এ কাজের জন্যে যে লোকবল এবং অর্থের প্রয়োজন তা কোম্পানির ছিল না। এই অবস্থায় লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীরা (Court of Directors) সিদ্ধান্ত নেয় যে, "এমন একটি রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করতে হবে, যে নীতি হবে চিরস্থায়ী ব্রিটিশ জাতি এবং কোম্পানির স্বার্থের অনুকূল।" অর্থাৎ তারা বাংলা তথা সমগ্র ভারতে শাসক ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিলেন।

এ রকম একটি পটভূমিতে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের নির্দেশ মাথায় নিয়ে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কর্নওয়ালিস ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজধানী কলিকাতায় এসে পৌঁছেন। তিনি এসেই কর্মকর্তাদের জরুরি নির্দেশ দেন যে, তারা যেন, ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত সরবরাহ করেন।

কর্নওয়ালিস ও জন শোর বিতর্ক

বাংলায় কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভাবান এবং অভিজ্ঞ ছিলেন জন শোর। তিনি ছিলেন রাজস্ব বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিগতভাবে অত্যন্ত সৎ। প্রথম দিকে তিনি চিরস্থায়ী ব্যবস্থার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। তাঁর সততা এবং রাজস্ব বিষয়ে গভীর জ্ঞানের কারণে কর্নওয়ালিস তাকে রাজস্ব উপদেষ্টা নিয়োগ করেন এবং রাজস্ব বিষয়ে কর্নওয়ালিস পুরোপুরি জন শোরের ওপর নির্ভর করেন। কিন্তু কিছু সময়ের মধ্যে জন শোর তাঁর মত পাল্টে দেন। তিনি ১৭৮৯ খ্রি. এক দীর্ঘ প্রতিবেদনে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তার প্রধান যুক্তি ছিল যে, এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে যে তথ্য প্রয়োজন তা কোম্পানির হাতে নেই। এজন্যে দেশব্যাপী একটি জরিপ করা প্রয়োজন।

অন্যদিকে কর্নওয়ালিস এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। জন শোরের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে তিনি যুক্তি দেখান যে, ১৭৬৫ খ্রি. থেকেই ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিশ-পঁচিশ বছরে যদি তথ্য সংগ্রহ শেষ না হয়, তবে কোন দিনই আর হবে না। দ্বিতীয়ত, ১৭৭০ খ্রি. যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাতে বাংলার লোকসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়এবংএতে কৃষি জমির এক তৃতীয়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। কর্নওয়ালিসের ধারনা ছিল যে, জমিদাররা যদি চিরস্থায়ীভাবে ভূমির অধিকার না পান, তবে তারা জঙ্গলাকীর্ণ কৃষি জমি আবাদ করবেন না।

চিরস্থায়ী প্রবর্তন এবং এই ব্যবস্থার সুফল ও কুফল

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কর্নওয়ালিস অভিজ্ঞ জন শোরের মতামত উপেক্ষা করে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।তিনি এজন্যে লন্ডনে কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর মতামত চাইলেন। কর্নওয়ালিসের প্রস্তাব পরিচালকমন্ডলীর সভায় অনুমোদিত হয় এবং ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় এসে পৌঁছায়।

ফলে দেখা যায় যে, কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ঘোষণা দেন। এ ব্যবস্থার সুফল ও কুফল সংক্ষেপে আলোচনা করা হলঃ

সুফল

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি তার বাৎসরিক রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছিল। ফলে কোম্পানির কর্মকর্তারা বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন করতে সমর্থ হয়।

(খ) জমিদারগণ যখন দেখলো তারাই জমির প্রকৃত মালিক তখন তারা নিজেদের পাশাপাশি ভূমি এবং রায়ত (কৃষক) শ্রেণীর উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন বাংলার বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায় যে, রায়তদের উপকারের জন্যে পুকুর খনন, বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা জমিদাররাই করেছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ও জমিদাররা তাদের রায়তদের রক্ষার চেষ্টা করতেন।

(গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে জমিদাররা পৃষ্ঠপোষকতা দান করে। ফলে কিছু ক্ষেত্রে শিল্পেরও উন্নতি হয়।

(ঘ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, ক্রমে এরাই ইংরেজদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুগত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। ইংরেজরা এই ব্যবস্থা থেকে এভাবে বড় ধরনের সুবিধা পেয়েছিল।

(ঙ) এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা রাজস্ব আদায়ের ঝামেলা থেকে মুক্তি পায়। ফলে তারা শাসন কাজ পরিচালনায় নিযুক্ত হয় এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

কুফল

বাংলা তথা ভারতের সমাজে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। দেখা যায় যে, শতাব্দীর পর শতাব্দী এ দেশের সমাজ ও রাজনীতিতে এই ব্যবস্থার প্রভাব রয়ে গিয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক ডব্লিউ. ডব্লিউ হান্টার কতিপয় কুফলের কথা লিখেছেন। যেমন ঃ

(ক) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়েছিল ভূমি জরিপ না করেই। রাজস্ব বিশারদ জন শোর এজন্যে এ ব্যবস্থার বিরোধিতা করে যেসব বিপদের কথা বলেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে বাস্তবেও সেগুলো প্রতিফলিত হলো। একজন জমিদারের অধীনে কি পরিমাণ জমি চাষাবাদের যোগ্য অথবা নিষ্কর অথবা গো-চারণ ভূমি ছিল তা নির্ধারণ না করেই শুধুমাত্র নিলামের ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছিল। ফলে কোথাও রাজস্বের হার অত্যধিক হয়েছিল, আর কোথাও হয়েছিল অনেক কম। এই অবস্থায় একজন জমিদারের জমিদারীর প্রকৃত সীমা নির্ধারিত না হওয়ায় অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা এবং নানা রকম অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) এই ব্যবস্থায় রায়ত শ্রেণী জমিদারের অত্যাচারের শিকার হয়। কর্নওয়ালিসের ধারণা ছিল যে, জমিদাররা যেভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব প্রদানের মাধ্যমে কোম্পানির কাছ থেকে ভূমির বন্দোবস্ত পেয়েছিলেন, একইভাবে জমিদাররাও রায়তদের জমির অধিকার প্রদান করবে। কিন্তু বাস্তবে তাঁর ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়। কারণ অতি তুচ্ছ কারণে বা বিনা কারণে অনেক সময় রায়তদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতো। উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় রায়তদের কাছ থেকে উচ্চহারে খাজনা আদায় করা হতো। ফলে তাদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পায়।

(গ) জমির মালিকানা চিরস্থায়ী হবার ফলে যে কোন উপায়ে জমি ক্রয় বা অধিকারের প্রশ্নটি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। ফলে জমির মূল্যবৃদ্ধি, জমি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা, মারামারি বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

(ঘ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার আর্থিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়লো। জমিদাররা পরিশ্রম না করে আরামপ্রিয় ও বিলাসী জীবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়লো।তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে বসবাস করা শুরু করলেন। তাদের অবর্তমানে নায়েব গোমস্তারা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে।এবং রায়তদের ওপর বিভিন্ন প্রচারের নির্যাতন ও অত্যাচার শুরু করে।রায়ত শ্রেণী সব অধিকার হারিয়ে ভূমিদাসে পরিণত হয়েছিল।অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক পরবর্তীকালে লিখেছেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি যে রাজনৈতিক সুবিধা পেয়েছিল তার জন্য অর্থনৈতিক মূল্য দিতে হয়েছিল অনেক বেশি। দীর্ঘমেয়াদে দেখা গেল যে, এই ব্যবস্থা একটি অত্যাচারের যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সর্বোপরি এই ব্যবস্থার ফলে গ্রাম থেকে শহরে সম্পদ স্থানান্তর হয়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি সংশোধনে বিভিন্ন পদক্ষেপ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরেজদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করেছিল সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থা চালু থাকার ফলে দেশের অর্থনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য ছিল না। শহুরে পরগাছা জমিদার শ্রেণী এবং তাদের এজেন্ট নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমাজের তৃণমূলের অধিকার হারা মানুষ ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছিল। কোম্পানির অনেক দূরদর্শী কর্মকর্তা এসব বিষয়ে সচেতন ছিলেন। ফলে দেখা যায় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিভিন্ন ত্রুটি দূর করতে বিভিন্ন আইন প্রবর্তন করা হয়। যেমন ১৮৫৯ খ্রি. লর্ড ক্যানিং রাজস্ব আইন (Rent Act) পাস করে অন্যায়ভাবে রায়তদের উচ্ছেদ করা বা অতিরিক্ত এবং নিয়ম বহির্ভুত খাজনা আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তবে ভূমিতে রায়তদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের Bengal Tenancy Act বা বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন। এই আইনে বলা হলো যে, সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোন রায়তকে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ১৯২৮ খ্রি. এই আইনের একটি সংশোধনী পাস হয় এবং এতে রায়তদের জমির স্বত্ব বিক্রির অধিকার দেয়া হয়। তবে এতে বলা হয় যে, এই বিক্রির সময় পাঁচ ভাগের এক ভাগ অর্থ বিনিময় মূল্য (Transfer fees) হিসেবে জমিদারকে দিতে হবে। ১৯৩৮ খ্রি. এক আইনে জমি বিক্রির সময় জমিদারকে প্রদেয় বিনিময় মূল্যের বিষয়টি রদ করা হয়।১৯৫০ খ্রি. এক আইনে পূর্ববঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়।

সারসংক্ষেপ

১৭৮৬ খ্রি.লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে আসেন।ভূমি ব্যবস্থায় তিনি যে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন তা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে পরিচিত। এটি প্রবর্তনের জন্যতিনি একা দায়ী ছিলেন না। বস্তুত, ১৭৭০ খ্রি. থেকে এ ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে নানা অভিমত গড়ে ওঠে এবং তাঁর সময়ে এটি বাস্তব রূপ লাভ করে (১৭৯৩খ্রি.)। এর ফলে কোম্পানি তার বাৎসরিক রাজস্ব সম্পর্কেনিশ্চিত হয়। কিন্তু জমি জরিপ না করে নিলামের ভিত্তিতে রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করায় রাজস্বের হার কোথাও অত্যধিক আবার কোথাও অনেক কম হয়েছিল। যাইহোক, এই বন্দোবস্তের ফলে বাংলার আর্থিক কাঠামো দুর্বলহয়ে পড়ে। এই ব্যবস্থায় সৃষ্ট ইংরেজদের অনুগত, শহুরে পরগাছা জমিদার শ্রেণী ও তাদের এজেন্ট নায়েব গোমস্তাদের অত্যাচারে অধিকারবঞ্চিত রায়ত শ্রেণীর ক্ষোভে ফুসে ওঠে। ফলে বিভিন্ন আইন প্রবর্তন করে এর ত্রুটিসমূহ দূর করার চেষ্টা করা হয়। অবশেষে ১৯৫০ সালেএক আইন দ্বারা পূর্ববঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিষিদ্ধ করে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭খ্রি.)।*

২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কে?
(ক) ক্লাইভ (খ) হেস্টিংস
(গ) কর্নওয়ালিস (ঘ) জন শোর।

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৭৫৭ খ্রি. (খ) ১৭৬০ খ্রি.
(গ) ১৭৬৫ খ্রি. (ঘ) ১৭৯৩ খ্রি.।

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন কে?
(ক) জন শোর (খ) রিপন
(গ) কার্জন (ঘ) ফুলার।

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয় কোন শ্রেণী–
(ক) রায়ত (খ) নায়েব গোমেস্তা
(গ) জমিদার (ঘ) ইংরেজ।

৫। বাংলা প্রজাস্বত্ব আইন প্রবর্তিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
(ক) ১৮৮০ খ্রি. (খ) ১৮৮৫ খ্রি.
(গ) ১৮৯০ খ্রি. (ঘ) ১৮৯৫ খ্রি.।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি সংশোধনে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন।
২। লর্ড কর্নওয়ালিস সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত- পূর্ব ভূমি ব্যবস্থা উল্লেখপূর্বক এই পদ্ধতি প্রবর্তনের পটভূমি বর্ণনা করুন।
২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফল বর্ণনা করুন।

পাঠ - ৩

টিপু সুলতান ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *টিপু সুলতানের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের পটভূমি জানতে পারবেন;*
- *টিপুর প্রতি ইংরেজদের মনোভাব জানতে পারবেন;*
- *তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *টিপুর পরাজয় সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *টিপুর আধুনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে একটি মূল্যায়ন তৈরি করতে পারবেন।*

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর) ভারতে কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধস্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। এগুলো ছিল বাংলা, অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা রাজ্য। এসব রাজ্যগুলোর মধ্যে প্রথমে বাংলা ইংরেজরা দখল করে নেয়। তারপর ব্রিটিশরা ক্রমশ গ্রাস করে সমগ্র ভারতবর্ষ। তবে একই সমান্তরালে যে সকল দেশীয় নরপতি ভারতে ইংরেজদের সার্বভৌম শক্তি বিস্তার রোধের চেষ্টা চালিয়ে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে টিপু সুলতান ছিলেন অন্যতম। বস্তুত ইংরেজদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিলেন টিপু। যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে লড়াই করে শহীদ হয়েছেন তিনি। এসব কারণে ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে টিপু এক কিংবদন্তীর নায়ক।

টিপু-ইংরেজ সংঘর্ষের পটভূমি এবং টিপুর প্রতি ইংরেজদের মনোভাব

টিপুর পিতা হায়দার আলী ১৭৬১ খ্রি. মহীশূরের ক্ষমতা দখল করেন। তিনি অল্পকালের মধ্যেই মহীশূরকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। ১৭৬৯ খ্রি. থেকে তিনি ইংরেজদের যুদ্ধে পরাস্ত করে মাদ্রাজ পর্যন্ত হঠিয়ে দেন। ১৭৮২ খ্রি. দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সময় তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হলে টিপু সুলতান ক্ষমতায় বসেন।

আঠার শতকের যে কোন ভারতীয় শাসকদের চেয়ে টিপু যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন যে, ব্রিটিশ শক্তি সমগ্র ভারতের যেকোন শক্তির পক্ষে আতঙ্ক ও বিপদের কারণ। তাই তিন ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অবিচল দৃঢ়তা ও অসম সাহস নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।এর ফলে ইংরেজরা তাঁকে মনে করেছিল এক ভয়ানক শত্রু। পিতার ন্যায় টিপুও ইংরেজ বিরোধিতা অব্যাহত রাখেন। অন্যদিকে পিটের ভারত শাসন আইনে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের বিষয়টি নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা দেখলেন যে, দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের নিরাপত্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি স্বার্থের ক্ষেত্রে টিপুর মহীশূর রাজ্য সবচেয়ে বড় হুমকিস্বরূপ। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকার নির্দেশ নিয়ে লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসেন। কিন্তু তিনি অল্পকালের মধ্যেই বুঝতে পারলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তার করতে হলে টিপুকে পরাজিত করতেই হবে। তদুপরি সেই সময় দক্ষিণ ভারতে শক্তি সাম্য (Balance of Power) টিপুর পক্ষে ছিল। শুধু দক্ষিণ ভারতেই নয় সমগ্র ভারতে টিপুর রাজ্য ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী, সুশাসিত ও সমৃদ্ধ। টিপু দক্ষিণ ভারতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং উদীয়মান শক্তি মারাঠাদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করে সবাইকে বিস্মিত

করেন। ভারতে ইংরেজদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় শক্তি ফরাসিদের সাথে টিপু সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, টিপু ফ্রান্সের বিপ্লবী দল 'জ্যাকোবিন ক্লাবের' সদস্য ছিলেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধে তিনি ফরাসিদের পাশাপাশি তুরস্কের সুলতানের সাহায্য কামনা করেন। ভারতের নতুন গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিস এসব কারণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং ভারতে ইংরেজ স্বার্থ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

স্বাধীনচেতা টিপু রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমে 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' নামে একটি গাছের চারা রোপন করেন। সে সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সেনাবাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব ছিল প্রকট। তিনি ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর অনুকরণে এবং ফরাসি সমরবিদদের তত্ত্বাবধানে একটি সুশৃঙ্খল ও আধুনিক বাহিনী গঠন করেন। তাঁর পদাতিক বাহিনীকে ইউরোপীয় ধরনের 'মাস্কেট' বন্দুক ও বেয়নেট দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। অবশ্য এসব অস্ত্র মহীশূরেই নির্মিত হতো। তিনি একটি আধুনিক নৌবহর গঠনের চেষ্টা করেন। এজন্যে তিনি দুটো জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র (Dockyard) প্রতিষ্ঠা করেন। এবং নৌবাহিনীর জাহাজের দুটো 'মডেল' টিপু নিজেই প্রস্তুত করেন। অর্থাৎ সুগঠিত ও সুসজ্জিত টিপুর বাহিনী ইংরেজদের মনে ভীতির সঞ্চার করে।

ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সম্মুখে টিপু যখন পাহাড়ের মতো অবিচল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন কর্নওয়ালিস টিপুর রাজ্য তথা মালাবারের ওপর লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। কর্নওয়ালিসের কাছে মনে হয়েছিল যে, মালাবার অঞ্চলের মসলা ও চন্দন কাঠের ব্যবসায় অংশ নেওয়া এবং ইংরেজদের স্বার্থে এই ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ইংরেজ উপনিবেশ বিস্তারের জন্যে কালিকট ও ক্যানন বন্দর দখল করা খুবই জরুরি ছিল। তদুপরি এই পথ দিয়ে ব্রিটেন সহ ইউরোপের সাথে নৌযোগাযোগ সবচেয়ে সহজতর ছিল। অন্যদিকে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে এবং আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ হারিয়ে কর্নওয়ালিস সদ্য ভারতে এসেছেন। ফলে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিপূরণের জন্যে কর্নওয়ালিস টিপুর সমৃদ্ধ রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করেন। সুতরাং দেখা যায় যে, ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তারের দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতে ইংরেজ শাসন সম্প্রসারণের প্রয়োজনও ছিল।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

১৭৮৩ খ্রি. টিপুর পিতা হায়দার আলীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয় অর্থাৎ যখন দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০–৮৪ খ্রি.) চলছিল।এ সময় ইংরেজরা হায়দার আলী ও টিপুর হাতে পর্যুদস্ত হয়। ১৭৮৪ খ্রি. টিপু বিদনুর ও ম্যাঙ্গালোর দখল করেন। ইংরেজরা তখন সন্ধি করতে বাধ্য এবং স্বাক্ষরিত হয় ম্যাঙ্গালোর চুক্তি। এ চুক্তি অনুযায়ী দু'পক্ষের মধ্যে বৈরিতার আপাত অবসান হয়েছিল সত্য, কিন্তু ইঙ্গ-মহীশূর বিরোধিতার কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। অর্থাৎ ম্যাঙ্গালোর চুক্তি ছিল নামমাত্র সন্ধি।টিপু কিংবা ইংরেজ উভয়ই বুঝেছিলেন যে, যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে। টিপু সুলতান অথবা ইংরেজ যেকোন একপক্ষ দাক্ষিণাত্য থেকে উৎখাত না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ চলবেই, এই নিরেট সত্য কথাটি কারো অবিদিত ছিল না। দুর্ধর্ষ স্বাধীনচেতা বীর টিপু দাক্ষিণাত্যের ভূমি থেকে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের জাল ছিন্ন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তিনি এজন্যে ইংরেজদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় রাষ্ট্র এবং এশিয়ার মিত্র রাষ্ট্রগুলোর সাহায্যও কামনা করেছিলেন।

এদিকে আঠার শতকের আশির দশকে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছিল। ১৭৮৮ খ্রি. কর্নওয়ালিস দাক্ষিণাত্যে টিপুর প্রতিদ্বন্দ্বী নিজামের কাছ থেকে গুন্টুর নামক ভূখন্ডটি উপহার হিসেবে গ্রহণ করেন। বিনিময়ে তিনি প্রয়োজনবোধে নিজামকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এক বছর পর (১৭৮৯ খ্রি.) কর্নওয়ালিস আরেক ধাপ অগ্রসর হয়ে দাক্ষিণাত্যে নিজামের নেতৃত্বে শক্তিসংঘ গঠনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু টিপুকে গ্রহণ করার কোন ইঙ্গিত তাতে ছিল না। এমনকি টিপুকে সংবাদ পর্যন্ত দেয়ার সৌজন্য কর্নওয়ালিস দেখাননি। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার জন ম্যালকম ও উলক্স কর্নওয়ালিসের এই আচরণকে টিপুর সাথে চুক্তিবিরোধী আচরণ এবং বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেছেন। এমতাবস্থায়

টিপু ১৭৮৯ খ্রি. ইংরেজ সমর্থক ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করে ৩য় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের (১৭৯০-৯২ খ্রি.) সূচনা করেন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা মাদ্রাজে ইংরেজ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করলে সম্ভবত ভয়ে তারা অগ্রসর হয়নি। ফলে কর্নওয়ালিস মাদ্রাজ সরকারের তীব্র নিন্দা করেন এবং দাক্ষিণাত্যে টিপুর প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা এবং নিজাম-এর সাথে 'ত্রিশক্তি মৈত্রী' (Triple Alliance) গঠন করেন। কর্নওয়ালিস নিজে সেনাপতি হিসেবে যুদ্ধে যোগ দেন। প্রথমে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হল এবং কোনপক্ষই জয়লাভ করতে সমর্থ হয়নি। শেষ পর্যন্তটিপু পরাজিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তম (১৭৯২ খ্রি.)-এর চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ সন্ধিতে কতকগুলো অপমানজনক শর্ত ছিল। যেমন- ইংরেজরা সম্পদশালী মালাবার উপকূল অধিকার করে নেয়। দ্বিতীয়ত, টিপুর রাজ্যের অধিকাংশ ভূখন্ড ইংরেজ, মারাঠা ও নিজাম দখল করে। তৃতীয়ত, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ ইংরেজদের প্রদান এমনকি টিপু তাঁর দুই পুত্রকেও ইংরেজদের হাতে জিম্মি হিসেবে সমর্পণ করেন।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

টিপু সুলতানের ন্যায় একজন স্বাধীনচেতা, দেশপ্রেমিক সুলতানের পক্ষে শ্রীরঙ্গপতনের অপমানজনক শর্ত বেশিদিন মেনে চলা সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে আঠার শতকের নব্বই-এর দশকে ফরাসি সমরবিদদের সহায়তা পেয়ে টিপু উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। এ সময় তিনি ফ্রান্সের বিপ্লবী দল জ্যাকোবিন পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং ইংরেজদের চরম শত্রু ফ্রান্সের বিপ্লবী ঘটনা প্রবাহ তাঁকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৭৯৯ খ্রি. তিনি মরিশাসে ফরাসি গভর্নরের কাছে দূত প্রেরণ করে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তিনি কিছু সৈন্য টিপুর কাছে প্রেরণ করেন।

অন্যদিকে ভারতে পৌঁছেই পরবর্তী গভর্নর জেনারেল ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলি টিপুর রণসজ্জার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে মাদ্রাজ কাউন্সিলের বিরোধিতা সত্ত্বেও টিপুকে দমন করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কর্নওয়ালিসের সময় স্বাক্ষরিত 'ত্রিশক্তি মৈত্রী' চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করেন। সহজেই নিজামকে ইংরেজের পক্ষে আনা হয়। কিন্তু মারাঠারা সহজে ইংরেজ পক্ষে যোগ দিতে চায়নি। তখন টিপুর রাজ্যের একাংশ মারাঠাদের প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তারা ইংরেজ পক্ষে যোগ দেয়।

রণপ্রস্তুতি সমাপ্ত করে ওয়েলেসলি টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তদুপরি তিনি তাঁর ফরাসি মৈত্রিতা সম্পর্ক কৈফিয়তও তলব করেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা টিপু এসব আহবান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়। সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ইংরেজরা উন্নত অস্ত্র এবং মারাঠা ও নিজামের বাহিনীর সহায়তায় টিপুকে তিন দিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে টিপু সদাশির ও মলভেলীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমে এসে সৈন্য সমাবেশ করেন। ইংরেজ বাহিনী টিপুর রাজধানী অবরোধ করে। উভয়পক্ষে একমাস যুদ্ধ চলে। টিপু বীরের মতো যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। ইংরেজরা এক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুকে পরাজিত করে স্বস্তিবোধ করে।

টিপুর পতনের পর গোটা রাজ্যকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। অধিকাংশ এলাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। নিজামকেও দেয়া হয় এক ক্ষুদ্রাংশ। মারাঠাদেরকে পূর্বশর্ত সহ কিছু ভূখন্ড দেয়ার কথা বললে তারা গ্রহণ করেনি। এই ব্যবচ্ছেদের পর মহীশূর রাজ্যের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশটিতে মহীশূরের প্রাচীন এক হিন্দু রাজবংশের উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতায় বসানো হয়।

টিপু সুলতানের পরাজয়ের কারণ

ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী সংগ্রামে টিপু এক অবিস্মরণীয় নাম। একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হন। তাঁর পতনের কিছু কারণ ছিল ঃ

১. অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, অশ্বারোহী বাহিনীর অবক্ষয় এবং টিপু কর্তৃক হায়দার আলীর সমর নীতি বর্জন এর জন্যে দায়ী। টিপুর জীবন আলেখ্যের রচয়িতা ঐতিহাসিক মহিবুল হাসান অবশ্য একে অন্যতম কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন, প্রধান কারণ হিসেবে নয়। শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি অনুযায়ী টিপু অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করে কৌশলগত ভুল করেছেন। কিন্তু ইংরেজদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির মর্যাদা তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন।

২. ইংরেজদের হাতে টিপুর পরাজয়ের মূল কারণ ছিল ইঙ্গ-মারাঠা-নিজামের ত্রিশক্তি জোট। ইংরেজরা চাতুর্যের সাথে দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তিকে টিপুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। তদুপরি সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা থেকে টিপুর সৈন্যসংখ্যা ছিল অনেক কম। অন্যদিকে টিপু দেশীয় রাজাদের সহায়তা পাননি, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে বৈদেশিক সহায়তাও পাননি। বিভিন্ন দেশে দূত প্রেরণ করে তিনি কেবল মৌখিক সহানুভূতি লাভ করেছিলেন। অল্প সংখ্যক ফরাসি স্বেচ্ছাসেবক টিপুকে সাহায্য করতে এসে তাঁর প্রতি ওয়েলেসলির সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করেছিল মাত্র।

টিপু সুলতানের কৃতিত্ব মূল্যায়ন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে যারা আমৃত্যু যুদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে টিপু সুলতান অন্যতম। তিনি ছিলেন মহান যোদ্ধা, দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনচেতা। ইংরেজদের সাথে অধীনতামূলক মিত্রতা স্বাক্ষর করে তিনি সহজেই নিজ রাজ্য ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু স্বদেশপ্রেম ও আত্মমর্যাদা বোধের কারণে তিনি তা করেননি। ইংরেজ দার্শনিক মিল টিপুকে প্রাচ্যের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। মুর এবং ডিরোম লেখকরা টিপুর রাজ্যের সমৃদ্ধি এবং জনগণের সুখ-শান্তির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ইংরেজরা যখন মহীশূর রাজ্য দখল করে তখন তারা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছিল যে, ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত সাম্রাজ্যের কৃষক-সমাজের তুলনায় মহীশূরের কৃষক-সমাজ অনেক বেশি সমৃদ্ধির অধিকারী। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোর লিখেছিলেন, "টিপুর রাজ্যমধ্যে প্রজাদের স্বার্থ সুরক্ষিত, কাজ করতে তারা উৎসাহিত হয়। কারণ শ্রমের ফল তারা ভোগ করতে পায়।" নতুন নতুন বিষয় প্রবর্তনের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে ধর্ম, ইতিহাস, রণনীতি, চিকিৎসা ও গণিতের গ্রন্থ ছিল। অন্যদিকে তিনি ছিলেন ধর্ম নিরপেক্ষ আধুনিক মানুষ। ১৭৯১ খ্রি. মারাঠা বাহিনী কর্তৃক 'শৃঙ্গেরি মঠ' লুণ্ঠিত হওয়ার পর টিপু সারাদাদেবীর মূর্তি নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেন। শ্রীরঙ্গনাথ মন্দিরের দূরত্ব টিপুর প্রাসাদ থেকে মাত্র একশত গজ। তিনি নিজ রাজ্যে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে রাজ্যটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। সুতরাং বলা যায় যে, এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে টিপুর পরাজয় ছিল নক্ষত্রের পতনের মতো।

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষে ইংরেজদের সার্বভৌম ক্ষমতা বিস্তারের বিরুদ্ধে যে সকল দেশীয় নরপতি অবিচল দৃঢ়তা, অসম সাহস দিয়ে প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেছিলেন, মহীশূরের টিপু সুলতান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। এ লক্ষ্যে তিনি ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর অনুকরণে একটি সুশৃঙ্খল ও আধুনিক বাহিনী গঠন করেন। ইংরেজরা টিপুকে দমনের জন্য মারাঠা ও নিজামের সাথে 'ত্রিশক্তি মৈত্রী' গঠন করে। লর্ডওয়েলেসলি টিপুকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে উভয়পক্ষের মধ্যে চতুর্থঈঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা হয়।স্বাধীনচেতা টিপু বীরের মতো যুদ্ধ করে প্রাণত্যাগ করেন। অতপর তাঁর রাজ্য বিভক্ত করা হয়। সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধে টিপুর পরাজয়ছিল নক্ষত্রের পতনের মতো।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*
২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। টিপুর পিতা হায়দর আলী কত খ্রিস্টাব্দে মহীশূর রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন–
(ক) ১৭৫৭ খ্রি. (খ) ১৭৬১ খ্রি.
(গ) ১৭৬৫ খ্রি. (ঘ) ১৭৭০ খ্রি.।

২। স্বাধীনতা প্রিয় টিপু কোথায় 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' রোপন করেন–
(ক) শ্রীরঙ্গপত্তমে (খ) হায়দ্রাবাদে
(গ) কলিকাতায় (ঘ) ঢাকায়।

৩। টিপুর বাহিনী যে বন্দুক ব্যবহার করতো তার নাম–
(ক) থ্রি-নট-থ্রি (খ) চাইনিজ
(গ) মাস্কেট (ঘ) জি-থ্রি

৪। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয় যে চুক্তি দ্বারা তার নাম–
(ক) কর্ণাটক চুক্তি (খ) ঢাকা চুক্তি
(গ) কলিকাতা চুক্তি (ঘ) ম্যাঙ্গালোর চুক্তি।

৫। টিপুকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন যে ইংরেজ তার নাম–
(ক) ক্লাইভ (খ) কর্নওয়ালিস
(গ) ওয়েলেসলি (ঘ) কার্জন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। টিপুকে কেন ইংরেজরা ভয়ানক শত্রু মনে করেছিল?
২। টিপু তাঁর সেনাবাহিনীকে আধুনিক করার জন্যে কি কি পদক্ষেপ নেন?
৩। টিপুর কৃতিত্ব সংক্ষেপে মুল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। টিপুর সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণগুলোর বিবরণ দিন।
২। তৃতীয় ও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের বিবরণ দিন।
৩। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে টিপু সুলতানের প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি চিত্র অংকন করুন।

পাঠ - ৪

লর্ড ওয়েলেসলি ও অধীনতামূলক মিত্রতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *লর্ড ওয়েলসলি কর্তৃক অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির উদ্ভব, বিকাশ এবং শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, কারা এটি গ্রহণ করেছিল এবং কারা এই নীতি প্রতিরোধ করেছিল তা জানতে পারবেন;*
- *ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র খুঁজে পাবেন।*

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যে সকল গভর্নর জেনারেলের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। ব্রিটেনে বোর্ড অব কন্ট্রোলের সদস্য থাকাকালীন সময়ে তিনি ভারত সম্পর্ক ধারণা লাভ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৭৯৮ খ্রি. ওয়েলেসলি যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন সাম্রাজ্য বিস্তারের বিভিন্ন পথ তার সামনে খোলা ছিল; কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা যেমন যুদ্ধের ব্যয়, ফরাসিদের সাথে শত্রুতা ইত্যাদি অনেক জটিলতাও ছিল। এই সময় পৃথিবীর নানা অংশে ফরাসিদের সাথে মরণপণ সংগ্রামে ব্রিটিশ জাতি নিয়োজিত ছিল। ওয়েলেসলি ভারতে এসে তার সমস্যাগুলোর পাশাপাশি প্রধান প্রতিপক্ষকেও চিহ্নিত করেন। তার পূর্বসূরী স্যার জন শোর ছিলেন একজন উদারপন্থী শাসক এবং রাজ্য জয় না করে তিনি নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করেন। ওয়েলেসলি দেখলেন যে, টিপু সুলতান এই নিরপেক্ষতার সুযোগ নিয়েই ফরাসি ও তুর্কিদের সাথে মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং ফরাসি সাহায্যের মাধ্যমেই ইংরেজদের ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। অন্যদিকে ইংরেজদের মিত্র নিজাম সংকটের সময় সহায়তা না পেয়ে ফরাসিদের সাহায্য কিছুটা গ্রহণ করেন। মারাঠারা সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে দুর্ধর্ষ শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার চেষ্টা করছেন, যদিও তাদের অন্তর্কলহ অব্যাহত ছিল।

তদুপরি বহিআক্রমণের কিছু সম্ভাবনা দেখা দিল। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ এবং ফ্রান্সের স্বয়ং নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিশরের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবেন এরকম সংবাদও প্রচারিত হচ্ছিল। ওয়েলেসলি দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে পরিস্থিতি ইংরেজদের অনুকূলেই পরিবর্তিত হতে থাকে। মারাঠাদের অন্তর্কলহ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, নিজাম মারাঠাদের ব্যাপারে আতঙ্কগ্রস্থ ছিলেন এবং ইংরেজ সাহায্য নিতে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। অন্যদিকে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের প্রধান শত্রু টিপুর ইংরেজ বিরোধী কর্মকান্ড থামিয়ে দেওয়ার পক্ষে নানা অজুহাতও তিনি প্রস্তুত করেছিলেন।

ব্রিটিশ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর সমর্থন

ওয়েলেসলি দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ইংরেজ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী তাঁকে নিরঙ্কুশ সমর্থন যুগিয়েছিল। তাদের সামনে পররাজ্য গ্রাসের পরিণামে (পণ্যসামগ্রী বিক্রির মাধ্যমে) প্রচুর মুনাফা লাভের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছিল। বিশেষ করে তারা পূর্ববর্তী ধারণা থেকে প্রয়োজনের তাগিদে সরে এসেছিল। এতদিন পর্যন্ত তারা ভারতে ইংরেজদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করতো না। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধ বিগ্রহের ফলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। আঠার শতকের শেষদিকে তারা উপলব্ধি করে যে,

সারা ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হলেই ব্রিটেনের শিল্প দ্রব্যের একটি বিশাল বাজার সৃষ্টি হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষও ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল, তবে ব্যবসায়ের যাতে ক্ষতি না হয়, সেটাও তারা বিবেচনা করছিল।

ব্রিটিশরা তখন বিশ্বব্যাপী ফরাসিদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত ছিল। এর মধ্যে ভারতেই তারা সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থানে ছিল। ইংরেজ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা ফরাসিদের নির্মূল করে ইংরেজ পুঁজির একচ্ছত্র বাজার প্রতিষ্ঠার জন্যে ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থন দেয়। ফলে যেসব দেশীয় রাজা ফরাসিদের প্রশ্রয় দেন, তাঁদেরকেও দমন করা ব্রিটিশদের পক্ষে আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব কারণে ওয়েলেসলি সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কতিপয় নীতি অনুসরণ করেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির উদ্ভব ও বিকাশ

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সাথে লর্ড ওয়েলেসলির নাম জড়িয়ে থাকলেও তিনি এই নীতির আবিষ্কারক নন। যদিও তার সময়েই এই নীতি দক্ষতার সাথে এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল। ওয়েলেসলির পূর্বসূরী লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসও এই নীতি সীমিতভাবে প্রয়োগ করেছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে ওয়েলেসলির লক্ষ্য ছিল ত্রিমুখী– অধীনতামূলক মিত্রতা, সরাসরি যুদ্ধ এবং সংযুক্তিকরণ নীতি। ওয়েলেসলির এই তিন নীতির মধ্যে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সবচেয়ে আলোচিত ও বিতর্কিত নীতি। সামরিক শর্তাদির ভিত্তিতে এই নীতি প্রণীত বলে এর নাম হয়েছিল অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Subsidiary Alliance)। এই নীতির প্রধান শর্ত বা বৈশিষ্ট্য হলো–(১) যেসব দেশীয় রাজা এই নীতি গ্রহণ করবেন তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ব্যতীত অপর কোন রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বা কোনরূপ আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন না। সংশ্লিষ্ট রাজ্যে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বা রেসিডেন্ট (Resident) রাখতে হবে। (২) দেশীয় রাজাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী তাঁরা নিজস্ব সেনাবাহিনী রাখতে পারবেন, কিন্তু সেই সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করবেন ইংরেজ সেনা নায়করা। (৩) যে সকল রাজ্যের রাজারা এই নীতি গ্রহণ করবেন তাঁরা তাঁদের রাজ্যে একদল ইংরেজ সেনাবাহিনী পোষণ করবেন এবং এই বাহিনীর ব্যয় নগদ প্রদান করবেন অথবা রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিবেন। বিনিময়ে ঐ রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করবে। (৪) যে সব রাজ্য এই নীতি গ্রহণ করবে সেসব রাজ্য হতে একমাত্র ব্রিটিশ ব্যতীত অন্যান্য ইউরোপীয় কর্মকর্তা এবং নাগরিকদের বহিষ্কার করবে।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগ

ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ছিল একটি ফাঁদ মাত্র। কোন রাজার পক্ষে ইংরেজদের সঙ্গে এই নীতিতে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ছিল ফাঁদে পড়ার সামিল। কেননা নিজ রাজ্য রক্ষার জন্যে ইংরেজ সাহায্যের বিনিময়ে তাঁকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবেশী রাজ্যের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদের নিষ্পত্তি করা যেমন নিষিদ্ধ ছিল, তেমনি রাজ্যের উন্নতির জন্য ইংরেজ ব্যতীত অন্য বিদেশী নিয়োগও ছিল নিষিদ্ধ। এককথায় বলা যায় যে, অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ কোন ভারতীয় শাসক তাঁর রাজ্যের বাইরে কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা এমনকি আলাপ-আলোচনারও অধিকার হারাতেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট রাজ্যের প্রতিদিনের কাজে প্রায়ই হস্তক্ষেপ করতেন এবং রাজাকে তার কথা মেনে চলতে হতো। এই প্রক্রিয়ায় রাজ্যটির অভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বভাবতই বিশৃঙ্খল এবং অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়তো। বিশেষ করে ইংরেজ সৈন্য পোষণের জন্যে সাধ্যাতিরিক্ত টাকা দিতে হতো। এই টাকার অঙ্ক কোম্পানি একতরফাভাবে নির্দিষ্ট করে দিত এবং এটা ক্রমাগত স্ফীত হয়ে উঠতো। অন্যদিকে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ রাজ্যগুলোর নিজস্ব সৈন্যবাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লাখ

লাখ সৈন্য জীবিকাচ্যুত হয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোতে দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং নৈতিক পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের অনেকেই ভ্রাম্যমান ডাকাতে পরিণত হয়। অন্যদিকে দেশীয় রাজারা ইতোপূর্বে প্রজাদের সুখ-শান্তির বিষয়টি বিবেচনা করতেন, কারণ তা না হলে প্রজা বিদ্রোহের ভয় ছিল। কিন্তু ইংরেজ আশ্রিত রাজ্যের রাজাদের প্রজা বিদ্রোহের ভয় ছিল না, কারণ তাঁরা জানতেন সেক্ষেত্রে রাজ্যে মোতায়েন ইংরেজ সৈন্যরাই তাঁদের রক্ষা করবে।

ইংরেজরা এই নীতি দ্বারা লাভবান হয়েছিল। কারণ ভারতীয় শাসকদের টাকায় তারা একটি বিরাট বাহিনীকে পোষণ করতে পেরেছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আশ্রিত রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী থাকায় ইংরেজরা বহু দূরবর্তী অঞ্চলেও যেকোন মুহূর্তে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারতো। অন্যদিকে ইংরেজরা যে কোন আশ্রিত রাজ্যের রাজাকে অনুপযুক্ত ঘোষণা করে তাড়িয়ে দিতে পারতো অথবা সরাসরি দখল করেও নিতো। ইংরেজদের পক্ষে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি যে কত লাভজনক হয়েছিল সেটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন– "খাইয়ে দাইয়ে একটা ষাঁড়কে বেশ হৃষ্টপুষ্ট করে তোলা হয় এই উদ্দেশ্যে যে, একদিন পরমানন্দে তার মাংস ভোজন করা যাবে। ইংরেজরা এইভাবে প্রতিটি আশ্রিত রাজ্যকেও রক্ষা করতো যাতে ভবিষ্যতে তাকে বেশ ভালভাবে গলাধকরণ করা যায়।"

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণকারী ভারতীয় রাজ্যসমূহ

সর্বপ্রথম (১৭৯৮ খ্রি.) হায়দ্রাবাদের নিজাম এই নীতি গ্রহণ করেন। ফলে ফরাসি সেনানায়কদের তত্ত্বাবধানে তিনি যে সৈন্যবাহিনী গঠন করেছিলেন, সে ভেঙ্গে দেন। চুক্তি অনুযায়ী ইংরেজরা তাঁর রাজ্যে ছয় ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ করে এবং তিনি ইংরেজদের বাৎসরিক ২,৪১,৭১০ পাউন্ড দিতে অঙ্গীকার করেন। দুই বছর পর (১৮০০ খ্রি.) ইংরেজ সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল, কিন্তু এজন্যে নিজাম তার রাজ্যে একাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দেন।

১৮০১ খ্রি. অযোধ্যার নবাব এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন। নবাব তাঁর রাজ্যের রোহিলাখন্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূমি সহ প্রায় অর্ধেক রাজ্য ইংরেজদের কাছে ছেড়ে দেন। এর বিনিময়ে তাঁর রাজ্যে একটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে নবাবের গতিবিধিও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এককথায় নবাব তার স্বাধীনতাই হারিয়েছিলেন।

টিপু সুলতানের প্রতিরোধ

মহীশূরের স্বাধীনচেতা নবাব টিপু সুলতান কখনোই অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে আবদ্ধ হতে চাননি। ১৭৯২ খ্রি. তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে পরাজয়ের পর টিপু বাধ্য হয়েই রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু টিপু ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিরোধে মরণপণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তিনি ফরাসি সাহায্যের জন্যে যেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তেমনি ইংরেজ বিরোধী সামরিক জোট গঠনের জন্যে আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু ওয়েলেসলি টিপুকে সময় দিতে চাননি; দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে টিপুর প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠা শক্তি এবং নিজাম (ইংরেজদের নতুন মিত্র)কে নিয়ে টিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। এর আগে ওয়েলেসলি টিপুকে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বললে তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং সূচনা হয় চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের। টিপু গর্ব সহকারে বলেছিলেন, "ইংরেজদের বৃত্তিভোগী রাজা ও নবাবদের দলভুক্ত হয়ে এবং বিধর্মীদের অনুগ্রহে ঘৃণীত জীবনযাপনের চেয়ে আমার পক্ষে মৃত্যুবরণই শ্রেয়।" টিপু ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই শহীদ হন।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ও মারাঠা

আঠারো শতকের শেষে স্বাধীনতা প্রিয় মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ বৃদ্ধি পায়।এই পরিস্থিতিতে ওয়েলেসলি পেশোয়া ও সিন্ধিয়াকে অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণের আহ্বান জানান। দূরদর্শী রাজনীতিক নানা ফড়নবীস এই ফাঁদে পড়তে অস্বীকার করেন। কিন্তু ১৮০২ খ্রি. ইংরেজদের হাতে মারাঠা বাহিনী পরাজিত হলে পেশোয়া বাজীরাও এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দের দিকে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয়ে অধীনতামূলক মিত্রতায় স্বাক্ষর করেন। এরা দুজনই ইংরেজদের হাতে তাদের রাজ্যের একাংশ তুলে দিয়েছিলেন। মারাঠাদের মধ্যে সবচেয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন হোলকার। শেষ পর্যন্ত ১৮০৬ খ্রি. কোম্পানি ও হোলকারের মধ্যে এক চুক্তির মাধ্যমে সংঘাতের অবসান হয়।

ওয়েলেসলির অপসারণ এবং অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির অবসান

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অংশীদাররা দেখলেন যে, ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে যুদ্ধের খরচ মেটাতে কোম্পানি লাভের বদলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। ১৭৯৭ খ্রি. এই লোকসানের মাত্রা যেখানে ছিল ১৭ মিলিয়ন পাউন্ড, ১৮০৬ খ্রি. তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ মিলিয়ন পাউন্ডে। নেপোলিয়নের কারণে ইউরোপে ব্রিটেনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় ভারতে বিপুল অর্থ ব্যয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার বন্ধ করতে চাইলেন কোম্পানির কর্তারা। ফলে ইতোমধ্যে বিজিত রাজ্যগুলো ভোগ করতেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। এই সিদ্ধান্তের পর ওয়েলেসলিকে স্বদেশে ফিরতে হয়। অবশ্য এটা সত্য যে, তার এই নীতির আগ্রাসী প্রয়োগের ফলেই ইংরেজরা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করতে সক্ষম হয়।

সারসংক্ষেপ

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যে সকল গভর্নর জেনারেলের ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যেসবচেয়ে আক্রমণাত্মক ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েলেসলি ভারতে এসে বিভিন্ন সমস্যার পাশাপাশি প্রধান প্রতিপক্ষকেও চিহ্নিত করেন। এবংসাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কতিপয় নীতি অনুসরণ করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*

২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। ওয়েলেসলি ভারতে আসেন–

(ক) ১৭৮০ খ্রি. (খ) ১৭৮৫ খ্রি.

(গ) ১৭৯৮ খ্রি. (ঘ) ১৮০০ খ্রি.।

২। ওয়েলেসলির পূর্ববর্তী গভর্নরের নাম কি?

(ক) ক্লাইভ (খ) হেস্টিংস

(গ) টিপু (ঘ) জন শোর।

৩। ভারতে সর্বপ্রথম কে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন–

(ক) নিজাম (খ) সিন্ধিয়া

(গ) টিপু (ঘ) বাজীরাও।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ওয়েলেসলি কেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন?

২। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সম্পর্কে মারাঠাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল?

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ওয়েলেসলি কেন অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তন করেন? কারা এই নীতির পেছনে সমর্থন যুগিয়েছিলেন?

২। অধীনতামূলক নীতির উদ্ভব ও বিকাশ এবং এর প্রধান প্রধান শর্তসমূহের বিবরণ দিন।

৩। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রয়োগের বিবরণ দিন। কারা এটি গ্রহণ করেন এবং কারা এর বিরোধিতা করেন?

পাঠ - ৫

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ঃ সংস্কারসমূহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কারের পটভূমি জানতে পারবেন;*
- *বেন্টিঙ্কের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে বেন্টিঙ্কের অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।*

বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে একজন হিতবাদী গভর্নর জেনারেল হিসেবে বেন্টিঙ্ক ভাস্বর হয়ে আছেন। জীবনের বিভিন্ন পর্বে তিনি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সেটিই তাঁকে একজন দূরদর্শী এবং মহৎ শাসকে রূপান্তরিত করে। লর্ড উইলিয়াম কেভেন্ডিশ বেন্টিঙ্ক যৌবনে ছিলেন ডিউক অব ওয়েলিংটনের অধীনে একজন সৈনিক। এরপর ভারতে আসেন (১৮০৩ খ্রি.) মাদ্রাজের গভর্নর হিসেবে এবং স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৮০৭ খ্রি.। মূলত ১৮০৬ খ্রি. ভেলোরে যে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয় সেজন্য কোম্পানি তাঁকে লন্ডনে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি কোম্পানির সদর দপ্তরে খ্যাতিমান প্রগতিশীল দার্শনিক জেমস্ মিলের সাথে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন। এ সময় বেন্টিঙ্ক মিলের সহচর্য ও জীবনবোধ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ১৮২৯ খ্রি. বেন্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সাথে অনেক উদারপন্থী এবং প্রগতিশীল রাজকর্মচারীও ভারতে আসেন। একই সময় লন্ডনে যে 'হুইগ' গোষ্ঠী ক্ষমতা লাভ করেছিল তাদের নীতিই ছিল প্রগতিবাদ ও সংস্কার। বেন্টিঙ্ক ছিলেন উদারপন্থী, সংস্কারবাদী এবং মুক্ত প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের মূর্ত প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের জনগণের প্রতি শাসক ইংরেজদের এক নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। এই চিন্তা থেকেই তিনি সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। অবশ্য সমালোচকদের মতে, বেন্টিঙ্কের এসব কর্মকান্ড ছিল ভিক্টোরিয় যুগের গর্বোদ্ধত ব্রিটিশ মনোভাবের প্রতিফলন মাত্র।

তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্কের সংস্কার

বেন্টিঙ্কের শাসনকাল যুদ্ধ-বিগ্রহ কিংবা সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে বিখ্যাত নয়। বরং শান্তি এবং সংস্কারের জন্যে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করেন। নিম্নে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

ক. অর্থনৈতিক সংস্কার

বেন্টিঙ্কের দায়িত্ব গ্রহণের আগে থেকেই কোম্পানির আর্থিক অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে এবং অর্থনীতির কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এই অবস্থায় কঠোর আর্থিক ব্যবস্থাপনা যেমন ব্যয় সংকোচন, রাজস্ব বৃদ্ধি, যুদ্ধ বিগ্রহে অর্থ ব্যয় না করে শান্তি স্থাপন ইত্যাদি নানামুখী পদক্ষেপ নেন তিনি। ব্যয় সংকোচনের জন্যে প্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ছিল সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস। তিনি সৈনিকদের

'অর্ধেক ভাতা' বাতিল করেন এবং সামরিক কর্তাদেরও বেতন কমিয়ে দেন। এই কঠোর পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় কর্মচারীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু কোম্পানির নীতি নির্ধারকরা বেন্টিঙ্কের সমর্থন করায় তিনি সহজেই বিক্ষোভ দমন করেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি আফিম ব্যবসায়ের ওপর কর ধার্য করেন। বাংলায় অসাধু উপায়ে যেসব নিষ্কর ভূমি দেখানো হয়েছিল তা বাতিল করে রাজস্ব ধার্য করেন। আগ্রা অঞ্চলের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন করে তিনি নতুন হারে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। এছাড়াও তিনি যুদ্ধ প্রবণ এলাকায় যেমন সিন্ধুর আমীরদের সাথে এবং পাঞ্জাবে রনজিৎ সিংহের সাথে সন্ধি স্থাপন করেন। এর ফলে ঐসব অঞ্চলে বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। এলাহাবাদে তিনি একটি রাজস্ব বোর্ড (Revenue Board) প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি দক্ষ ব্যবস্থাপনার সূচনা করেন যার ফসল অল্পদিনের মধ্যে কোম্পানি পেয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, বেন্টিঙ্কের দায়িত্ব গ্রহণের সময় কোম্পানির বাৎসরিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল দশ লক্ষ টাকা; কিন্তু দু'তিন বৎসর দেখা গেল যে, ঘাটতি পূরণের পরও আরো পনের লক্ষ উদ্বৃত্ত হতো।

খ. প্রশাসনিক সংস্কার

কর্ণওয়ালিস বাংলা তথা ভারতে যে ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর প্রবর্তন করেছিলেন, বেন্টিঙ্ক তাতে ব্যাপক পরিবর্তন করেন। কর্নওয়ালিস যেসব ভ্রাম্যমান বিচারালয় ও আপীল আদালত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেন্টিঙ্ক তা বাতিল করে দেন। কারণ এই ব্যবস্থায় বিচার কাজে অযথা বিলম্ব হতো। নতুন ব্যবস্থায় ফৌজদারি মামলার দায়িত্ব জেলার বিচারকদের হাতে প্রদান করেন এবং কালেক্টরদের ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করেন। তাঁর সময় প্রথম কয়েকটি জেলা নিয়ে একটি বিভাগ তৈরি করা হয় এবং এর প্রধান হিসেবে যিনি নিযুক্ত হন, তাকে বলা হতো কমিশনার। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জজ ও পুলিশের কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ছিল তাঁর। বেন্টিঙ্ক যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের সরকারি কাজে নিযুক্ত করার নির্দেশ দেন। বেন্টিঙ্কের আগ পর্যন্ত ভারতীয়দের মধ্য থেকে কোন বিচারক নেয়া হতো না। তিনি শুধু ভারতীয়দের বিচারকই নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেন এমন নয়, তাঁদের বিচার ক্ষমতা, পদমর্যাদা এবং বেতনও বৃদ্ধি করেন। আগে আদালতগুলোতে ফারসি ভাষায় বিচার কাজ চলতো। তিনি স্থানীয় ভাষায় বিচার কাজ চালানোর অনুমতি দেন। এর ফলে বিচার ব্যবস্থা জাতীয় চরিত্র ধারণ করে।

বেন্টিঙ্কের সময় থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কাছ থেকে 'গোপন রিপোর্ট' (Confidential Report) প্রেরণের বিধান চালু করেন। এই পদ্ধতির মাধ্যমেই কর্মকর্তাদের পদোন্নতি হতো। আজো সরকারের চাকুরিতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

গ. সামাজিক সংস্কার

বেন্টিঙ্কের সংস্কারের মধ্যে সামাজিক সংস্কারেই সুদূর প্রসারী ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে ভারতীয় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেসব কুসংস্কার বিরাজমান ছিল তার অনেকটাই দূরীভূত করার যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন তিনি। বাংলা তথা ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়াপত্তনও করেন তিনি।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম থেকেই ভারতে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে। ফলে এদেশীয় জনগণের মধ্যে কুসংস্কার এবং অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল সে বিষয়ে ভারতের এই নব্য শাসকরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নেয়। সে সময় রাজপুত, জাঠ প্রভৃতি জাতির মধ্যে শিশু হত্যার মতো অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতের অনেক উপজাতির মধ্যে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ট হলে তাকে গঙ্গা নদীতে নিক্ষেপ করা হতো এবং এটাকে তারা পূণ্য কাজ হিসেবে বিবেচনা করতো। এসব নিষ্ঠুর প্রথা দেখে

প্রগতিশীল ও উদারপন্থী ইংরেজ শাসকগণ বিচলিত বোধ করেন। ফলে দেখা যায় যে, স্যার জন শোরের সময় ১৭৯৫ খ্রি. এক আইনে শিশু হত্যা দন্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ভারতের সমাজের সবচেয়ে নিষ্ঠুর প্রথা সতীদাহ তখনও অব্যাহত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু বিধবাগণকে স্বামীর চিতায় ঝাঁপ দিতে হতো এবং এভাবে তাদের জোরপূর্বক হত্যা করা হতো। অবশ্য অনেকেই স্বেচ্ছায় ঝাঁপ দিতো। যাহোক এ প্রথা ছিল অমানবিক। ফলে দেখা যায় যে, লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় থেকে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। পরবর্তীকালে অনেক গভর্নর জেনারেল এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন, তবে সফল হননি। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বেন্টিঙ্ক এই প্রথা নিষিদ্ধ করতে সমর্থ হন। তিনি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিচারকগণ, রাজা রামমোহন রায় এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু উদারপন্থীদের সহযোগিতায় এক আইনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। শুধু তাই নয়, সতীদাহে প্ররোচনা এবং সহায়তা করাকেও গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে ঘোষণা করা হয়েছিল।

বেন্টিকের অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব হলো 'ঠগী দমন'। এই ঠগীরা ছিল কালী ও দুর্গার উপাসক। ডাকাত এবং মানুষ খুনই ছিল তাদের পেশা ও নেশা। মুঘল যুগ থেকেই এরা সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার চালিয়ে আসছিল। এরা নিরীহ পথিকদের অনুসরণ করে নির্জন স্থানে শ্বাসরোধ করে হত্যা এবং সর্বস্ব লুট করতো। বেন্টিঙ্ক ঠগী দমনের জন্য এক স্বতন্ত্র প্রশাসনিক বিভাগ স্থাপন করেন এবং কর্নেল শ্লীম্যানের সহায়তা ১৮২৯–৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ঠগীদের সম্পূর্ণভাবে দমন করেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন

আধুনিক শিক্ষা প্রচারের মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে একটি বিপ্লব সাধন করেছিলেন। এই আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেন লর্ড বেন্টিঙ্ক। অবশ্যক বেন্টিঙ্কের আগে থেকেই একটি প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে সর্বপ্রথম কোম্পানি বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। এই টাকার দেশীয় ভাষা যেমন সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য অর্থ ব্যয় করা হয়। ১৮৩৩ খ্রি. বেন্টিঙ্ক সিদ্ধান্ত নেন যে, ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের জন্যে এই টাকা ব্যয় করা হবে। তৎকালীন ব্রিটিশ সেক্রেটারী প্রিন্সেপ (H.T.Princep) এবং ঐতিহাসিক উইলসন (Wilson) প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষার জন্যে সরকারি অর্থ ব্যয় করার পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে গভর্নর জেনারেলের আইন বিষয়ক সদস্য এবং বেন্টিঙ্কের ঘনিষ্ঠ সহচর লর্ড মেকলে যুক্তি দেখান যে, ভারতীয় ভাষাগুলোর অবস্থা এত হীন যে, এর মাধ্যমে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান অসম্ভব। রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সে সময়ের প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ মেকলের বক্তব্যকে সমর্থন করেন। ফলে দেখা যায় যে, ১৮৩৫ ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাদানের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঐ বছর বেন্টিঙ্কের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাই-এ এলফিন্‌স্টোন ইনস্টিটিউশন স্থাপন করা হয়। সরকারি উদ্যোগে বেশ কিছু ইংরেজি স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছিল।

ইতিহাসে বেন্টিঙ্কের স্থান

উদারপন্থী এবং মানবতাবাদী বেন্টিঙ্ক রাজ্য বিস্তারের চেয়ে সমাজ সংস্কার এবং প্রজাদের উন্নয়নের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। লর্ড মেকলে বেন্টিঙ্কের প্রশংসা করে বলেছেন যে, তিনি ছিলেন একজন জনহিতৈষী শাসক। মেকলে আরো বলেছেন যে, লর্ড বেন্টিঙ্ক সর্বপ্রথম প্রাচ্য দেশের স্বৈরাচারী শাসকদের বদলে ব্রিটিশ জাতির স্বাধীনতার স্বাদ ভারতীয়দের দিয়েছিলেন। এই বক্তব্যে অতিরিক্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাস থাকলেও বিষয়টি অসত্য নয়। আধুনিক ও মুক্তমনা মানুষ তৈরির জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার, নিষ্ঠুর ও অমানবিক ধর্মীয় প্রথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে বেন্টিঙ্ক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করেন। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে বেন্টিঙ্ক তাই অমর হয়ে আছেন।

সারসংক্ষেপ

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রি. ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে যুদ্ধ-বিগ্রহ বা সাম্রাজ্যবিস্তারের পরিবর্তে অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু যুগান্তকারী সংস্কার সাধন করেন। সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধকরণ ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন তার মধ্যে অন্যতম। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে হিতবাদী একজন শাসক ও সংস্কার হিসেবে তিনি তাই অমর হয়েআছেন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)।*

২. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বেন্টিঙ্ক কত খ্রি. গভর্নর জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকরেন–

(ক) ১৮২০ (খ) ১৮২৯

(গ) ১৮৩৮ (ঘ) ১৮৪৭ খ্রি.।

২। বেন্টিঙ্ক কোথায় রাজস্ব বোর্ড স্থাপন করেন–

(ক) ঢাকায় (খ) কলিকাতায়

(গ) এলাহাবাদে (ঘ) চট্টগ্রামে।

৩। প্রশাসনিক সংস্কারের জন্যে বেন্টিঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন–

(ক) বিভাগ (খ) জেলা

(গ) থানা (ঘ) ইউনিয়ন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। বেন্টিঙ্ক রাজস্ব ব্যয় সংকোচন ও রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য কি কি পদক্ষেপ নেন?

২। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে বেন্টিঙ্কের ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

৩। সংক্ষেপে বেন্টিঙ্কের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। বেন্টিঙ্কের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২। ভারতীয় সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে বেন্টিঙ্কের পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করুন। এগুলো ভারতীয় সমাজকে কতটুকু রূপান্তরিত করেছিল।

পাঠ - ৬

লর্ড ডালহৌসি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তারের বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *'স্বত্ববিলোপ নীতি' প্রয়োগের মাধ্যমে লর্ড ডালহৌসি কিভাবে দেশীয় রাজ্যসমূহকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন তা বলতে পারবেন;*
- *লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রতিক্রিয়া জানতে পারবেন;*
- *লর্ড ডালহৌসির সংস্কার কার্যাদির বিবরণ দিতে পারবেন।*

অসাধারণ উদ্ভাবনী ও সংগঠনী শক্তির অধিকারী লর্ড ডালহৌসির শাসনকাল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৪৮ থেকে ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল ভারতে বৃটিশ শাসনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে আসার পূর্বে লর্ড ডালহৌসি বোর্ড অব ট্রেডের সভাপতি হিসেবে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তিনি যখন ভারতে আসেন তখন তাঁর বয়স ছিল ৩৬ বৎসর। তিনি তৎকালীন সময় পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে বয়সে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। মাত্র ৮ বৎসরের শাসনে ভারতে ইংরেজ শাসনের আকৃতি ও প্রকৃতিতে তিনি স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন।

ভারতের ইতিহাসে লর্ড ডালহৌসির অন্যতম প্রধান কীর্তি হলো ভারতে ক্ষমতার সম্প্রসারণ।তাঁর সম্প্রসারণ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল রাজ্য জয় এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তা সৎ ছিল না।ভারতের জনসাধারণের জন্য তা মঙ্গলকর বা অমঙ্গলকর কিনা সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা ঘোর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসির নিকট একেবারে গৌণ ছিল। অর্থাৎ তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতির একমাত্র কারণ ছিল ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করা। প্রধানত এই সাম্রাজ্য লিপ্সাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তিনি তিনটি নীতি অনুসরণ করেছিলেন– (১) প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য বিস্তার, (২) স্বত্ববিলোপ নীতির দ্বারা রাজ্য দখল, (৩) কুশাসন ও অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার।

১. প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য বিস্তার

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮–৪৯ খ্রি.)

১৮৪৬ খ্রি. লর্ড হার্ডিঞ্জ ও শিখদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (লাহোর চুক্তি) অনুযায়ী আটজন শিখ সর্দার নিয়ে গঠিত অভিভাবক সভা পাঞ্জাবস্থ বৃটিশ রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী পাঞ্জাবের নাবালক মহারাজা দলীপ সিংহের পক্ষে শাসনভার পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলে মহারাজা সম্পূর্ণরূপে বৃটিশ প্রভাবাধীন হয়ে পড়েন। হার্ডিঞ্জ-এর এই ব্যবস্থায় শিখরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। ব্রিটিশ রেসিডেন্টের কর্তৃত্ব তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। তাছাড়া শিখ নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাদের পরাজয় বরণ (প্রথম শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৬ খ্রি.) করতে হলেও তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে পরাভূত বলে মেনে নিতে পারেনি। কাজেই তারা নতুন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। বৃটিশ রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের

অভিযোগে কোম্পানি পাঞ্জাবের রাণীমাতা ঝিন্দনকে চুনার দুর্গে নির্বাসিত করলে শিখদের মনে গভীর অসন্তোষ দেখা দেয়। রাণীমাতা ঝিন্দনের প্রতি কোম্পানির এ অপমানজনক আচরণ শিখ জাতির আত্মমর্যাদায় আঘাত করে। এসঙ্গে জলন্ধর দোয়াবে চড়া হারে ভূমি রাজস্ব প্রবর্তন করায় স্থানীয় শিখ সর্দারগণের মধ্যেও অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠে। উপরন্তু পাঞ্জাবে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের উদ্ধত আচরণ, শিখ পুনরুদ্ধারগুলোর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং শিখ রমনীদের নির্যাতন শিখদের ধর্মবিশ্বাস ও আত্মাভিমানে আঘাত দেয়। এভাবে যখন শিখদের মনে ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে ঠিক সেই সময় মুলতান ও হাজারার শাসনকর্তাগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

দেওয়ান মুলরাজ ছিলেন মুলতানের শাসনকর্তা। তিনি আইনত পাঞ্জাবের মহারাজার অধীন হলেও এক প্রকার স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করছিলেন। ব্রিটিশ রেসিডেন্ট প্রভাবিত পাঞ্জাবের অভিভাবক সভা মুলরাজকে মুলতানের শাসন সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ দাখিল করতে নির্দেশ দিলে তিনি পদত্যাগ করবেন বলে জানান। ফলে পাঞ্জাবের ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড কিউরি কাহান সিং মানকে তাঁহার স্থলে মুলতানের দেওয়ান নিযুক্ত করেন।নবনিযুক্ত দেওয়ানকে সহযোগিতা করার জন্য ভ্যান্স এগ্‌নিউ ও এন্ডারসন নামে দুজন ইংরেজ কর্মচারীকে মুলতানে প্রেরণ করেন। মুলরাজ উক্ত দু'জন ইংরেজ কর্মচারীকে হত্যা করে ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় মুলতানে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এই সঙ্গে সমগ্র মুলতান ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহে জ্বলে ওঠে। মুলতানের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাবের শিখ সৈন্যগণও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পেশওয়ার পুনরুদ্ধারের আশায় আফগান জাতিও এই বিদ্রোহে শিখদের পক্ষে যোগদান করে। এই অবস্থায় লর্ড ডালহৌসি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এটি দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ নামে অভিহিত। ইংরেজ সেনাপতি লর্ড হিউ গাফ্ বিশ হাজার সৈন্য এবং একশত কামানসহ পাঞ্জাব অভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য বোম্বে থেকেও একদল সৈন্য আনা হয়। ইতোমধ্যে সেনাপতি হারবার্ট এডওয়ার্ডস্ মুলতান আক্রমণ করলে মুলরাজ মুলতানের দুর্গে আশ্রয় নেন। লাহোর হতে বৃটিশ রেসিডেন্ট স্যার হেনরি লরেন্স শের সিংহের নেতৃত্বে আরও একদল সৈন্য মুলরাজের বিরুদ্ধে পাঠান। কিন্তু শের সিংহ মুলরাজের পক্ষে যোগদান করে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ফলে সেনাপতি লর্ড গাফ্ প্রথমে শের সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং রামনগর নামক স্থানে শের সিংহকে আক্রমণ করেন। কিন্তু শের সিংহ পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। অতপর ঝিলাম নদীর তীরে চিলায়ানওয়ালায় শিখদের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৪৯ খ্রি.)। যুদ্ধের প্রথম দিকে ইংরেজ বাহিনী সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও শেষ দিকে শিখ বাহিনীর হস্তে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু শিখরা পরাজিত ইংরেজ বাহিনীর পশ্চাৎধাবন না করে লুটতরাজে ব্যস্ত থাকার সুযোগে ইংরেজ বাহিনী পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে মুলতান আক্রমণ করে। মুলতানের শিখ বাহিনী বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেও অবশেষে আত্মসমর্পন করে। মুলরাজ বন্দি হন। মুলরাজকে সামরিক আদালতের বিচারে নির্বাসিত করা হয়।

মুলতান অধিকারের পর তথাকার ইংরেজ বাহিনী এবং লর্ড গাফ্-এর মিলিত সৈন্যবাহিনী চিনাব নদীর তীরে গুজরাট নামক এক শহরের উপকণ্ঠে শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯খ্রি.)। এই যুদ্ধে শিখরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে আফগানিস্তানের দিকে পালিয়ে যায়। শের সিংহ আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়। এভাবে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের অবসান ঘটে।

অতপর লর্ড ডালহৌসি পাঞ্জাব অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। বৃটেনের পরিচালক সভার অনুমতির অপেক্ষা না করেই পাঞ্জাব অধিগ্রহণের ঘোষণা পত্র জারি করেন– (১) সমগ্র পাঞ্জাব বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয় এবং মহারাজা দলীপ সিংহকে পদচ্যুত করে ইংল্যান্ডে নির্বাসিত করা হয়, (২) দলীপ সিংহকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড বৃত্তি বা পেনশন দানের ব্যবস্থা করা হয়, (৩) খালসা বাহিনী ভেঙ্গে দেয়া হয়, (৪) পাঞ্জাব অধিকারের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগান রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত বর্ধিত হয়, (৫) হেনরি লরেন্সকে চীফ কমিশনার করে পাঞ্জাবের শাসনভার তাঁর হস্তে অর্পণ করা হয়, (৬) এই প্রদেশের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় এবং নানাবিধ সামাজিক শাসনসংক্রান্ত সংস্কার প্রবর্তিত হতে থাকে, (৭) ইংরেজ কর্মচারীদের সুদক্ষ

শাসন পরিচালনের ফলে শিখরা কিছুকালের মধ্যেই পরাজয়ের গ্লানি বিস্মৃত হয়ে ইংরেজদের অনুগত হয়ে পড়ে। এ আনুগত্যের প্রমাণ মিলে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ও সিপাহী বিদ্রোহের সময়।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ (১৮৫২ খ্রি.)

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮২৬ খ্রি.) পর ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্তানুসারে ক্রাউফোড ব্রহ্মদেশে ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি বর্মী সরকারের সাথে এক চুক্তি সম্পাদিত করে ইংরেজ বণিকদের জন্য কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। কিন্তু বর্মী সরকার স্থায়ীভাবে ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলে ক্রাউফোডের পর তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন ইংরেজ রেসিডেন্ট ব্রহ্মদেশে ছিলেন না।১৮৩০ খ্রি. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মেজর হেনরি বার্নেটকে ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করলে তিনি ব্রহ্ম সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করেন। কিন্তু ১৮৩৭ খ্রি. ব্রহ্মদেশের নতুন রাজা থারাবাডি ইয়ান্দাবুর সন্ধির শর্ত পালন করতে অস্বীকৃতি জানান এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণ শত্রুতা শুরু করেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে রেসিডেন্সি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হলে সেই সংবাদ লর্ড ডালহৌসির নিকট পৌঁছামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। তিনি ব্রহ্ম সরকারের নিকট এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে কমোডোর ল্যাম্বার্টকে একটি রণতরীসহ ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। ব্রহ্মরাজ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তিনি ইংরেজ কোম্পানিকে সন্তুষ্ট করার জন্য রেঙ্গুনের গভর্নরকে বরখাস্ত করেন। কিন্তু কমোডোর ল্যাম্বার্ট এতে সন্তুষ্ট না হয়ে ব্রহ্ম সরকারের একটি রণতরী দখল করে নিলে ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।

১৮৫২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কোম্পানির বাহিনী মার্তামান ও বেসিন অধিকার করে। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ প্যাগোডার ওপর গোলাবর্ষণ করে ধ্বংস করে দেয়। ঐ বৎসরের অক্টোবর মাসে জেনারেল গড্‌উইন প্রোম ও অপরাপর কয়েকটি শহর অধিকার করে নেন। কোম্পানির সাথে ব্রহ্মরাজ সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানালে ডালহৌসি সমগ্র পেগু অধিকার করে তা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। এভাবে ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়ায় চট্টগ্রাম হতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমগ্র উপকূল অঞ্চল যেমন বৃটিশ অধিকারভুক্ত হলো, তেমনি সমুদ্রপথের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্যে ব্রহ্মদেশ বৃটিশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল।

সিকিম রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকার

কোম্পানির সাম্রাজ্যের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল সিকিম রাজ্য। সেখানে বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ডক্টর ক্যাম্পবেল নামে জনৈক ইংরেজ কর্মচারী এবং ডক্টর হুকার নামে অপর একজন ইংরেজ উপস্থিত হলে সিকিম রাজ্যের রাজা তাদের বন্দি করেন। এর প্রতিশোধ নিতে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে সিকিম আক্রমণ করে এই রাজ্যের একাংশ অধিকার করে নেন।

২. স্বত্ববিলোপ নীতির প্রয়োগ দ্বারা রাজ্য অধিকার

বৃটিশ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারে লর্ড ডালহৌসির অন্যতম প্রধান কৌশল ছিল স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক প্রবর্তিত এই নীতির প্রয়োগের দ্বারা ডালহৌসি অনেক দেশীয় রাজ্য অধিকার করে নিয়েছিলেন।এই নীতির মূল বক্তব্য হলো, বৃটিশের অধীন অথবা বৃটিশ-শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কোন দেশীয় রাজ্যের রাজার কোন সন্তান অর্থাৎ কোন স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী না থাকলে সেই রাজ্য সরাসরি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে পড়বে। কোন দত্তকপুত্রকে এসব রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া যাবে না। বৃটিশ সরকার

থেকে 'বিশেষ অনুমতি' নিয়ে দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার লর্ড ডালহৌসি অস্বীকার করেন। ঘটনাচক্রে এই সময়ে একই সঙ্গে বহু ইংরেজ-আশ্রিত দেশীয় রাজ্যের রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ডালহৌসির পক্ষে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের অপূর্ব সুযোগ আসে। তিনি এই নীতির দ্বারা এসব রাজ্য অধিকার করে নেন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বত্ববিলোপ নীতি ডালহৌসি উদ্ভাবন করেননি। ডাইরেক্টর সভা ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির অধীনস্থ দেশীয় রাজ্যের রাজাগণকে দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতি যাতে সহজে দেওয়া না হয় সে নির্দেশ প্রদান করেছিল। ১৮৪১ খ্রি. আরো নির্দেশ দিয়েছিল যে, সম্মানজনক এবং ন্যায্য পন্থায় কোম্পানি যে কোন সম্পত্তি বৃটিশ অধিকারভুক্ত করার চেষ্টায় যেন কোন ত্রুটি না করে। কাজেই কুখ্যাত 'স্বত্ববিলোপ নীতি' লর্ড ডালহৌসির নামের সঙ্গে জড়িত থাকলেও বস্তুত এই নীতি তিনি উদ্ভাবন করেননি। পূর্ববর্তী গভর্নর জেনারেলগণ এই নীতি প্রয়োগ করা সমীচীন মনে করেননি। কিন্তু লর্ড ডালহৌসি ভারতবাসীর চিরাচরিত রীতিনীতি ও ন্যায্য অধিকার উপেক্ষা করে 'স্বত্ববিলোপ নীতির' ব্যাপক প্রয়োগের দ্বারা এই কুখ্যাত নীতির সঙ্গে নিজের নাম জড়িত করেছিলেন।

লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে নিম্নলিখিত দেশীয় রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেনঃ

সাঁতারা ঃ ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানিই সাতারা রাজ্যটি সৃষ্টি করেছিল। ঐ বৎসর পেশোয়া পদের বিলুপ্তি ঘটলে শিবাজীর এক বংশধরকে পেশোয়া রাজ্যের একাংশে সাঁতারা রাজ্যের রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সাঁতারা রাজ্যের রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা যাবার পূর্বে বৃটিশের অনুমতি ছাড়া এক দত্তকপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজার মৃত্যু হলে কোম্পানি দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার অগ্রাহ্য করে এবং সাঁতারা বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়।

নাগপুর ও সম্বলপুর ঃ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের রাজা অপুত্রক দত্তকবিহীন অবস্থায় মারা গেলে লর্ড ডালহৌসি নাগপুর বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। এখানে উল্লেখ্য, নাগপুর কোম্পানি কর্তৃক সৃষ্ট কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও নিছক সামাজ্য বিস্তারের কারণেও রাজনৈতিক গুরুত্ব বিবেচনা করে সাঁতারা রাজ্যের অনুরূপ নীতি প্রয়োগ করে নাগপুর বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়েছিল।

ঝাঁসি, ভগৎ, উদয়পুর ও করৌলি ঃ ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ঝাঁসির রাজা অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে দত্তকপুত্রের দাবি অস্বীকার করে ঝাঁসি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। একই কারণে লর্ড ডালহৌসি ভগৎ, উদয়পুর, করৌলি প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যগুলোকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং ভগৎ ও উদয়পুর রাজ্য দু'টি এদের উত্তরাধিকারীদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ডাইরেক্টর সভা করৌলি রাজ্যের ক্ষেত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে সেই রাজ্যটিও এর উত্তরাধিকারীর নিকট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। করৌলি ছিল বৃটিশের মিত্ররাজ্য।

কর্ণাটক, তাঞ্জোর অধিকার ও ধন্দুপন্থর বৃত্তি বাতিল ঃ একই নীতি অনুসরণ করে লর্ড ডালহৌসি ১৮৫৩ খ্রি. কর্ণাটকের নবাবীর বিলোপ সাধন করেন এবং ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাঞ্জোর রাজ্য অধিকার করেন। ১৮৫৩ খ্রি. বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র ধন্দুপন্থ নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করে দেন।

৩. কুশাসন ও অরাজকতার অভিযোগে দেশীয় রাজ্য অধিকার

অযোধ্যা ঃ লর্ড ডালহৌসির রাজ্য বিস্তারের তৃতীয় নীতি ছিল কুশাসনের অভিযোগে দেশীয় রাজ্য গ্রাস। এই নীতি প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, রাজার বাস্তব ক্ষমতাহীন দায়িত্ব কোম্পানির ওপর মানুষের বিশ্বাসকে নষ্ট করে দেবে। এই নীতির প্রথম প্রয়োগ হলো অযোধ্যায়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ডালহৌসি কোম্পানির বোর্ড অব ডাইরেক্টর্সের নির্দেশে অযোধ্যা রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অযোধ্যায় দুর্নীতি ও কুশাসন বহুদিন থেকে চলে আসছিল। কিন্তু এর জন্য সামগ্রিকভাবে লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' চুক্তি বহুলাংশে দায়ী। শাসনব্যবস্থায় নবাবের প্রকৃত অধিকার ছিল না। সুতরাং তাঁর

দায়িত্ববোধও দিন দিন কমে আসতে থাকে। এরূপ অবস্থায় অভ্যন্তরীণ অবস্থার অধপতন অনিবার্য ছিল। কিন্তু এর জন্য মূলত কোম্পানি দায়ী হলেও কোম্পানি রাজ্যটি গ্রাস করে। স্যার হেনরি লরেন্স কোম্পানির এই কর্মকান্ডকে "জাতীয় বিশ্বাসের অমার্জনীয় লংঘন" বলে অভিহিত করেছেন।

বেরার অধিকার ঃ অতপর ডালহৌসি হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রতি দৃষ্টি দেন।লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক চুক্তির দ্বারা নিজামকে তাঁর রাজ্যে নিজ খরচায় বৃটিশ সৈন্য রাখতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু নিজাম এই অর্থ নিয়মিত প্রদান করতে অসমর্থ হলে বেরার রাজ্যটি লর্ড ডালহৌসি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।বেরার বোম্বাই প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ফলে মাদ্রাজের সঙ্গে বোম্বাইয়ের স্থলপথে কোম্পানির রাজ্য সংযুক্ত হয়।

লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রতিক্রিয়া

লর্ড ডালহৌসি বৃটিশ শাসনের সুব্যবস্থায় চরম আস্থাবান ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, দেশীয় রাজ্যের দুর্নীতি ও কুশাসন দূর করে যদি সর্বত্র বৃটিশ শাসন প্রবর্তন করা যায় তাহলে জনসাধারণের সুখ ও উন্নতি বিধান সম্ভব হবে। এই বোধ থেকেই তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির উদ্ভব হলেও কার্যত তাঁর নীতি ভারতবর্ষে চরম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে ডালহৌসি ভারত ত্যাগ করেন। একবৎসর পরেই ভারতে এক মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রি.) আরম্ভ হয়। অনেক সমালোচক তাঁর অনুসৃত নীতিকেই এই বিদ্রোহের কারণ বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতি তথা দত্তকপুত্র গ্রহণে বাধাদানের নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মনে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। ঝাঁসির রাণী, ধন্দুপন্থ নানাসাহেব প্রমুখ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধে ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ হিন্দু সিপাহীদের ধর্মীয় সংস্কারে আঘাত করেছিল। অযোধ্যার নবাবকে মসনদচ্যুত করা হলে অযোধ্যার প্রায় ষাট হাজার সৈনিক বেকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া নবাবের মসনদচ্যুতিতে সৈনিকদের জাতীয় চেতনাও আহত হয়েছিল। অযোধ্যার সৈন্যগণ বিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন অজুহাতে লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি ভারতীয় রাজন্যবর্গকে বিশেষভাবে আশঙ্কিত করে তুলেছিল। তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে, বৃটিশ শক্তির প্রতি যতদূর সম্ভব আনুগত্য প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাঁদের রাজ্যগুলোর বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হবার প্রবল সম্ভাবনা রয়ে গেছে।তাঁরা লর্ড ডালহৌসির প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সন্দেহ করতে থাকেন। তৃতীয়ত, ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদ নীতি দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে দারুন আতঙ্ক ও সন্দেহের সৃষ্টি করার ফলে জনসাধারণের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা সম্পূর্ণ না হলেও অংশত মহাবিদ্রোহের জন্য দায়ী।

লর্ড ডালহৌসির সংস্কারসমূহ

ভারতবর্ষের ইতিহাসে লর্ড ডালহৌসি একজন বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারকারী হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী কার্যক্রমের ফলে তাঁর যৌক্তিক ও জনহিতকর সংস্কারগুলো সাম্রাজ্যবাদী কুখ্যাতির আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। বস্তুত, তিনি যেমন ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী তেমনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ শাসক ও সংস্কারক। তিনি শাসনক্ষেত্রে নানা সংস্কার প্রবর্তন করে অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন। ঐতিহাসিক হান্টার মন্তব্য করেন যে, ওয়েলেসলির আমলের স্থানু ভারতবর্ষকে তিনি বর্তমান যুগের প্রগতিশীল ভারতবর্ষে পরিণত করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, "শাসন ও অন্যান্য বিভাগে এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে ডালহৌসি তাঁর ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যাননি।"

শাসন সংস্কার

বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্ব তখন পর্যন্ত গভর্নর জেনারেলের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। লর্ড ডালহৌসি গভর্নর জেনারেলকে বাংলার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেন। তাঁর সময়কাল থেকে বাংলার জন্য একজন লেফটেনান্ট গভর্নর নিযুক্ত করেন। কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করার জন্য তাঁর সময় থেকে সর্বপ্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ আরম্ভ হয়। এভাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। তাঁর শাসনকালীন সময়ে যেসব নতুন রাজ্য কোম্পানির অধিকারভুক্ত হয় সেগুলোর ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এই ব্যবস্থা 'নন্-রেগুলেশন' ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থায় নতুন অধিকৃত অঞ্চলগুলো পরিচালনার জন্য কমিশনার পদ সৃষ্টি করা হয়। কমিশনারগণ প্রশাসনিক কাজ পরিচালনার জন্য সরাসরি গভর্নর জেনারেলের নিকট দায়ী থাকতেন।

শিক্ষা সংস্কার

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসি অমর কীর্তির অধিকারী। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লন্ডনস্থ বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস উড তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ ভারত সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। লর্ড ডালহৌসি স্যার চার্লস উডের শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ কার্যকরী করতে তৎপর হন। তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। প্রতিটি প্রেসিডেন্সিতে এবং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের জন্য শিক্ষা অধিকর্তার (D.P.I.) পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে ইংল্যান্ডের আদর্শে উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তাঁর শাসন আমলের অন্যতম কীর্তি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপাতত কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোর পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদানের দায়িত্ব পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ খোলা হয়। এসঙ্গে সাহিত্য ও বিজ্ঞান গবেষণার ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে গ্রান্টস-ইন-এইড নামক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয়সমূহে ইংরেজি, মাতৃভাষা ও সংস্কৃত বা ফার্সি এই ত্রিভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

রেলপথ নির্মাণ

ডালহৌসিকে ভারতীয় রেলপথের জনক বলা হয়ে থাকে। ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য তিনি তাঁর বিখ্যাত 'রেলপথ স্মারকলিপি' রচনা করেন।এই স্মারকলিপিকে ভারতের ভবিষ্যতের 'রেলপথ নির্মাণের নীল নকশা' বলা হয়। তাঁর শাসনকালে রেল ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই থেকে থানে পর্যন্ত সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়। পরের বৎসর কলিকাতা-রাণীগঞ্জ রেলপথ তৈরি হলে কলিকাতার কারখানা ও পাটকলগুলোতে কয়লা পরিবহনের সুবিধা হয়। রেলপথ নির্মাণের দায়িত্ব লর্ড ডালহৌসি শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত না করে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের ওপর অর্পণ করেন। এর ফলে ভারতে বৃটিশ মূলধন নিয়োগের পথ উন্মুক্ত হয়। উদ্যোক্তাদেরকে রেলের জন্য জমি কোম্পানি বিনামূল্যে অর্পণ করে। রেলপথের দ্বারা ভারতের দূর-দূরান্ত সংযুক্ত হলে পরোক্ষভাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়।

সামরিক সংস্কার

ডালহৌসির শাসনামলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য পূর্বে বাংলা থেকে পশ্চিমে পাঞ্জাব এবং সিন্ধুদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ওপর কর্তৃত্ব রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সর্বদা প্রস্তুত অবস্থায় মোতায়েন রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই কারণে বাংলার গোলন্দাজ বাহিনীকে কলিকাতা থেকে মীরাটে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈনিকদের আনুপাতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস করতে সচেষ্ট হন এবং ইউরোপীয় সৈনিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে তৎপর হন। ডালহৌসি ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মূলভিত্তি বলে উল্লেখ করেন। ডালহৌসি পাঞ্জাবের শাসনকর্তার অধীনে

একটি নতুন সৈন্যদল গঠন করেন। এই সৈন্যদলের শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা এবং বেতনের হার ভারতীয় সৈন্যবাহিনী থেকে পৃথক ধরনের করা হয়। তিনি গুর্খাদের নিয়ে একটি সৈন্যদল গঠন করেন। এবং এই সৈন্যদলের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি পায় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন। লর্ড ডালহৌসির দ্বারা সৃষ্ট পাঞ্জাব রেজিমেন্ট ও গুর্খা রেজিমেন্ট ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ দমনে বৃটিশ শাসকদের অশেষ বীরত্বের সঙ্গে সহায়তা করে এবং আনুগত্যে অবিচল থাকে।

বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন

লর্ড ডালহৌসিকে ভারতীয় তার বিভাগের জন্মদাতা বলে উল্লেখ করা যায়।তাঁর শাসনামলে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ লাইনের দ্বারা কলিকাতাকে পেশোয়ার, বোম্বাই ও মাদ্রাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। বৈদ্যুতিক তারের দ্বারা সংবাদ আদান-প্রদান অতি সহজ সাধ্য হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রকৃতই বিপ্লব সৃষ্টি করে। ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দে মহাবিদ্রোহের সময়কালে বৈদ্যুতিক তারে দ্রুত সংবাদ প্রেরণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ সুবিধা লাভ করে। এই কারণে বিদ্রোহে যোগদানের জন্য প্রাণদন্ড প্রদানকালে সিপাহীগণ চিৎকার করে বৈদ্যুতিক তারকে অভিসম্পাত দেয় এবং বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ বলে উল্লেখ করে।

ডাক বিভাগের সংস্কার

আধুনিককালের ডাক বিভাগের প্রবর্তন লর্ড ডালহৌসির অপর এক কীর্তি। তিনি ডাক চলাচল ব্যবস্থা সুসংহত করবার জন্য ডাইরেক্টর জেনারেল-এর পদ সৃষ্টি করেন। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পত্র প্রেরণের জন্য দু-পয়সার ডাক টিকেট প্রবর্তন করেন। ডাক ব্যবস্থা সুসংবদ্ধ হবার ফলে সরকারি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

পূর্ত বিভাগের উন্নতি সাধন

লর্ড ডালহৌসি পূর্ত বিভাগকে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। এই বিভাগকে তিনি খাল খনন, রাস্তা ও সেতু নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। পূর্ত বিভাগের এসব কাজের জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেন। তিনি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সংস্কার সাধন করেন এবং বহু রাস্তা তৈরি করে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করেন। তাঁর শাসনকালে বহুসংখ্যক খাল খনন করা হয়। মোট ব্যয় হয় চৌদ্দ লক্ষ পাউন্ড। তন্মধ্যে লর্ড ডালহৌসির আমলে ব্যয় হয় বার লক্ষ ত্রিশ হাজার পাউন্ড। এই খালগুলো দ্বিমুখী দায়িত্ব পালন করে। খালগুলোর সাহায্যে একদিকে নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হয়, অপরদিকে কৃষিক্ষেত্রে সেচের পানি সরবরাহের ব্যবস্থা হয়।

বাণিজ্যিক সংস্কার

ডালহৌসির সংস্কারসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক সংস্কার উল্লেখযোগ্য।তিনি অবাধ বাণিজ্যের নীতি অনুসরণ করে ভারতের বন্দরগুলো বিদেশীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।এসঙ্গে কলিকাতা, বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি বন্দরের উন্নতি সাধন করেন এবং বন্দরগুলোতে যাতে সহজে সমুদ্রগামী জাহাজ আসতে পারে তার জন্য বহুসংখ্যক বাতিঘর বা লাইট হাউজ নির্মাণ করেন। ভারত থেকে তুলা, পাট, শন, চা প্রভৃতি পণ্য বিপুল পরিমাণে রপ্তানির ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় তুলা, পাট, শন প্রভৃতি সস্তা কাঁচামাল ইংল্যান্ডের ল্যাঙ্কশায়ার ও

মানচেষ্টারের কারখানাগুলোতে ব্যবহৃত হয়।এসব কারখানাজাত উৎপন্ন দ্রব্য ভারতে উচ্চমূল্যে অবাধে বিক্রয় করে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিরা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

সামাজিক সংস্কার

লর্ড ডালহৌসি সামাজিক ক্ষেত্রে বিবিধ সংস্কার করেন। ধর্মান্তরিত হবার অপরাধে হিন্দুদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়ার ব্যবস্থা তিনি রদ করেন।বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় তাঁর শাসনকালে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইন প্রবর্তিত হয়।

সারসংক্ষেপ

লর্ড ডালহৌসি ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গভর্নর জেনারেল। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তাই তিনি যে কোন প্রকারে সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ যুদ্ধের দ্বারা পাঞ্জাব, পেগু সহ ব্রহ্মদেশের উপকূল অঞ্চল এবং সিকিম রাজ্যের একাংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কুখ্যাত স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে সাঁতারা, নাগপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসি, ভগৎ, উদয়পুর, করৌলি এবং কুশাসন ও অরাজকতার অভিযোগে অযোধ্যা, অধীনতামূলক মিত্রতার শর্তানুযায়ী হায়দ্রাবাদের নিজাম অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে বেরার বৃটিশ অধিকারভুক্ত করে নেন।তবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী হলেও শাসনক্ষেত্রে বহুবিধ সংস্কার সাধন করে ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের সূচনা করেছিলেন। তিনি নতুন অধিকৃত অঞ্চল শাসনের জন্য কমিশনার-এর পদ সৃষ্টি, সিভিল সার্ভিসের ভিত্তি স্থাপন ও ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।এছাড়া তিনি রেলপথ নির্মাণ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ডাক বিভাগ ও পূর্ত বিভাগের উন্নতি সাধন, বাণিজ্যিক, সামাজিক ও সামরিক সংস্কার সাধন করেন। তাই শাসক ও সংস্কারক হিসেবে লর্ড ডালহৌসি কৃতিত্বের দাবিদার।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারতবর্ষের ইতিহাস (মুঘল ও ব্রিটিশ ভারত)*, দ্বিতীয় খন্ড।
২. এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।*
৩. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭ খ্রি.)*
৪. ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস।*

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। চিলায়ানওয়ালার যুদ্ধ সংঘটিত হয়–

(ক) ১৮১৯ খ্রি. (খ) ১৮২৯ খ্রি.
(গ) ১৮৩৯ খ্রি. (ঘ) ১৮৪৯ খ্রি.।

২। ঝাঁসি রাজ্যটি বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়–

(ক) ১৮৪০ খ্রি. (খ) ১৮৫০ খ্রি.
(গ) ১৮৫২ খ্রি. (ঘ) ১৮৬০ খ্রি.।

৩। উচ্চশিক্ষার জন্যডালহৌসি কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন–

(ক) ৩টি (খ) ৫টি
(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
৩। স্বত্ববিলোপ নীতির প্রবর্তক কে? এই নীতির বিষয়বস্তু কি?
৪। লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দিন।
৫। লর্ড ডালহৌসির শিক্ষা সংস্কারের বর্ণনা দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। লর্ড ডালহৌসির আমলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ইতিহাস বিবৃত করুন।
২। লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক প্রবর্তিত সংস্কারগুলো পর্যালোচনা করুন।

পাঠ - ৭

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তার ও দমনের ইতিবৃত্ত এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ বলতে পারবেন;*
- *১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।*

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। ১৭৫৭ খ্রি. পলাশীর প্রান্তরে যে ইংরেজ শাসনের মূলভিত্তি ভারতে প্রোথিত হয়েছিল তা সর্বপ্রথম প্রচন্ডভাবে আলোড়িত হয়েছিল এই সিপাহী বিদ্রোহে। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কখনও দ্রুতগতিতে কখনও বা ধীরগতিতে কখনও যুদ্ধের সাহায্যে কখনও কূটনৈতিক চালের দ্বারা সর্বত্র ভারতবর্ষের ওপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব এবং সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন ভারতবাসীর চিরাচরিত জীবনযাত্রার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, প্রশাসনিক প্রভৃতি কারণে ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়।১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পূর্ববর্তী একশত বৎসরে বহু সংখ্যক বিদ্রোহ এবং গণঅভ্যুত্থান প্রধানত আঞ্চলিক ভিত্তিতেই সংঘটিত হয়েছিল বলেই ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে সেগুলো দমন করা সম্ভবপর হয়েছিল। এই বিদ্রোহগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল, সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ (১৭৭২), চুঁয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৯), বেরিলির বিদ্রোহ (১৮১৬), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), ফরায়েজি ও ওয়াহাবি বিদ্রোহ এবং বৃটিশ সৈন্যবাহিনীভুক্ত ভারতীয় সিপাহীদের একাধিক বিদ্রোহ।

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ

সিপাহী বিদ্রোহের কারণ সম্বন্ধে সমসাময়িক ইংরেজদের মধ্যেও মতবিরোধ ছিল। স্যার জন লরেন্স একে সামরিক বিদ্রোহ হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল কার্তুজ সংক্রান্ত বিষয়। কিন্তু লর্ড স্যালসবেরির মতে, এইরূপ একটি ব্যাপক ও শক্তিশালী বিদ্রোহ কেবলমাত্র কার্তুজের ঘটনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল তা বিশ্বাস করা কঠিন। অপরদিকে জেমস্ আউট্রাস একে একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এর মূল উদ্দেশ্য ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের অবসান বলে মনে করতেন। তাঁর নিকট এটি ছিল হিন্দুদের সহযোগিতায় মুসলমানদের ষড়যন্ত্র। পরবর্তীকালেও অনেক সময় চর্বি মাখানো কার্তুজের বিষয়কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে এই বিদ্রোহকে গুরুত্বহীন করবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়েছে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ববর্তীকালে যে সকল বিবরণ লিখিত হয় সেগুলো প্রধানত ব্রিটিশ শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গিকে অনুসরণ করায় পরাজিতদের পক্ষ সমর্থন করে সমসাময়িক কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। এ কারণে এই অভ্যুত্থানের মূল উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব কি তা

আমাদের অনুধাবন করা বিশেষ কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ বহু গভীরে প্রোথিত ছিল। এর সঙ্গে ভারতে ইংরেজ শাসনের চরিত্র অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। প্রধানত রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক এবং সামরিক কারণের সমন্বয়ে এই বিদ্রোহের উদ্ভব হয়েছিল ও তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল।

রাজনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানত লর্ড ডালহৌসির অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নীতি ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। তাঁর স্বত্ববিলোপ নীতি সমগ্র ভারতেই তুমুল বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। এই নীতির মধ্য দিয়ে ডালহৌসি যে নির্লজ্জ পররাজ্য লোলুপতার পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্রতা লাভ করেছিল। সাম্রাজ্য বিস্তার করতে গিয়ে লর্ড ডালহৌসি ভারতীয়দের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারকে কোন মর্যাদা দেননি। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও- এর দত্তকপুত্র নানা সাহেবকে বৃত্তিদান বন্ধ করে দেওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে আক্রোশের সৃষ্টি হয়েছিল। কুশাসনের অভিযোগে যখন ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্যটি গ্রাস করেন এবং দিল্লির মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে তাঁর পূর্বপুরুষদের রাজপ্রাসাদ লালকেল্লা থেকে বহিষ্কার করেন তখন মুসলমানদের মধ্যে তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। ডালহৌসির নীতি শুধুমাত্র রাজন্যবর্গকেই অসন্তুষ্ট করেনি, তাঁর অনুসৃত নীতির ফলে রাজানুগৃহীত কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ এবং শঙ্কার ভাব সৃষ্ট হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, অযোধ্যার ওপর প্রত্যক্ষ ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাতে পূর্বতন তালুকদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীসমূহ বিপদের সম্মুখীন হয় এবং তাদের অসংখ্য অনুচর চরম দুর্দশায় পড়ে। বোম্বাই অঞ্চলে ইনাম কমিশন এর কার্যকলাপে প্রায় বিশ হাজার ভূস্বামী জমির অধিকারচ্যুত হন। ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রায় সর্বত্র জনসাধারণের মনে বৃটিশ রাজস্ব সম্বন্ধে বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা ও বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্থানীয় কর্মচারী, স্থানীয় শাসকের সৈন্যবাহিনী প্রত্যেকেই ব্রিটিশ শাসকের উগ্রনীতিতে আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। এক কথায় উচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যে এক বিচিত্র শঙ্কা, ভীতি এবং বিদ্বেষভাব সৃষ্টি হতে থাকে।

সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ

উল্লেখিত রাজনৈতিক আশঙ্কার সঙ্গে যুক্ত হয় সামাজিক ও ধর্মীয় আশঙ্কা। ব্রিটিশ শাসনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের যে সকল সামাজিক কুপ্রথা দূর করা হয়েছিল তা রক্ষণশীল হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। স্বধর্মনাশ ও খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ফলে তাদের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছিল। সতীদাহ নিবারণ, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ বেআইনী ঘোষণা, হিন্দু ধর্মত্যাগীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার প্রথাকে নিষিদ্ধকরণ প্রভৃতি সামাজিক সংস্কার, রেলপথ নির্মাণ, টেলিগ্রাফের প্রবর্তন, দেশীয় শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন প্রভৃতি আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, ইংরেজরা এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর। স্বভাবতই তারা এতে ভীত হয়ে পড়ে। এছাড়া এই সময়ে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা ভারতীয়দের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্যে সক্রিয় নীতি গ্রহণ করতে থাকেন। সুতরাং ভারতীয়রা স্বভাবতই ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ ও আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। এছাড়া দেশীয় রাজন্যবর্গ তাঁদের পূর্ব ক্ষমতা ও প্রাধান্য হারালে দেশীয় শিল্পী ও কারিগরগণ তাদের জীবিকা অর্জনের সুবিধাগুলো থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। এমনকি দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুগৃহীত পন্ডিত ও মৌলভিগণ সরকারি অর্থানুকূল্য থেকে বঞ্চিত হন। ফলে অর্থনৈতিক কারণে এই দুই শ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের চরম শত্রু হয়ে ওঠে এবং বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ

করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও উচ্চপদ থেকে এদেশীয়দের বঞ্চিত করায় এদেশীয়দের মনোগত বিক্ষোভ।

শাসন সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক কারণ

ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে এদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর নিদারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়।ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায় তাদের পূর্বতন প্রভাব ও মর্যাদা হারায়।নতুন শাসনব্যবস্থায় তাঁদের উচ্চপদ লাভের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে তিরোহিত হয়। কেননা সকল সরকারি উচ্চপদ একমাত্র ইউরোপীয়দের জন্যে নির্দিষ্ট রাখা হয়। যদিও ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের কোম্পানির সনদে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি গৃহীত হয়েছিল, তথাপি তা কার্যে পরিণত করা হয়নি। সামরিক বিভাগেও উচ্চপদ লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। একজন ভারতীয়ের পক্ষে মাসিক ৬০ থেকে ৭০ টাকা বেতনের সুবাদারের পদ লাভই যথেষ্ট মনে করা হতো। বেসামরিক বিভাগে সর্বাপেক্ষা উচ্চপদ যা একজন ভারতীয়ের পক্ষে লাভ করা সম্ভব ছিল তা হল সদর আমিনের পদ। নতুন শাসনব্যবস্থায় এদেশীয়দের পদোন্নতির সম্ভাবনা প্রায় ছিল না।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নীতি ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে বিপর্যস্ত করে তোলে। কোম্পানি তার বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য রাজনৈতিক শক্তির দ্বারা ভারতীয় হস্তশিল্পকে বিলুপ্ত করে এবং ভারতের সকল উৎপাদনকেই বিদেশী শোষণের বস্তুতে পরিণত করে। ভারতের শিল্পোৎপাদন ধ্বংস হবার ফলে কৃষি এবং ভূমির ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়ে। কৃষির অগ্রগতির সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এতে দেশের দারিদ্র্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দী সম্বন্ধে তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ 'সিয়ার-উল-মুতাখখেরিন' থেকে জানা যায় যে, বৃটিশ শাসকগণ এদেশের মানুষকে ঘৃণা করতেন এবং তাদের সংশ্রব যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই বৈষম্যের কারণ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন, কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস থেকে লর্ড ডালহৌসি পর্যন্ত যে পরম্পরা চলতে থাকে তাতে ভারতবাসী সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। এই বৈষম্যের ফলে উভয় পক্ষের মানসিক আবহাওয়া এমনই দূষিত হয়ে পড়ে যে, সরকারের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সাধারণ মানুষ দূরভিসন্ধি খুঁজে পায়। এদেশের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ সম্বন্ধে ইংরেজদের অবজ্ঞা এতই প্রকট ছিল যে, সতীদাহ প্রথা বন্ধের মতো হিতকর প্রশাসনিক পদক্ষেপকে মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে। ভারতে বৃটিশ শাসনের মূলগত উদ্দেশ্য যে বাণিজ্যিক ও সামাজিক স্বার্থসিদ্ধি তা বুঝতে যেমন ভারতবাসী বিলম্ব করেনি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তারা সন্দেহ করে যে, এদেশের বহু যুগব্যাপী পরম্পরাকে চুর্ণ করার পরিকল্পনাও তাদের ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতবাসী ও ইংরেজ শাসকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি রূপ এসে দাঁড়িয়েছিল।

সামরিক কারণ

এভাবে যখন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তীব্র আশঙ্কার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তখন সামরিক বাহিনীর অসন্তোষই বিদ্রোহের দাবানল সৃষ্টি করে। সিপাহীদের অসন্তোষ এই বিদ্রোহের একটি প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় ভারতীয় সিপাহীদের অবদান ছিল অপরিসীম। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে বহু ক্ষোভ ও অসন্তোষ ছিল।এই সৈন্যবাহিনীকে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হতো। এই সেনাবাহিনীর মধ্যে ইংরেজ ও ভারতীয়দের সংখ্যায় বিরাট তারতম্য ছিল। যদি সামরিক বাহিনীতে ইউরোপীয়দের সংখ্যা অধিক হতো তাহলে হয়তো অসন্তোষ এরূপ তীব্র আকার ধারণ করতো না। এছাড়া সামরিক বাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতাও শিথিল হয়ে পড়েছিল। এই বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে উত্তর ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দু সৈনিকদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা সমুদ্র যাত্রাকে অশাস্ত্রীয় কাজ বলে মনে করতো। হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রার প্রতি এই আপত্তি অগ্রাহ্য করে ১৮৫৬ খ্রি. লর্ড ক্যানিং 'General

Services Enlistment Act' নামে একটি আইন প্রবর্তন করেন এবং এর দ্বারা সিপাহীদের যে কোন স্থানে যুদ্ধ করতে যাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়। তাছাড়া সিপাহীদের অসন্তোষের একটি প্রধান কারণ ছিল তাদের স্বল্প বেতন।সিপাহীদের বেতন বৃদ্ধির দাবি বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। সর্বশেষে ইংরেজ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ভারতীয় সিপাহীদের প্রতি দুর্ব্যবহার তাদের মনে তীব্র ইংরেজ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। এই অবস্থায় একটি বিশেষ গুজব দেশের সর্বত্রই বিস্তৃত হয় যে, পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসর পরে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটবে।এই বিশ্বাস সিপাহীদের মধ্যে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

যখন সকল দিক দিয়েই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত, তখন এক বিশেষ ধরনের বন্দুক ও কার্তুজের প্রবর্তনে বিস্ফোরণ ঘটে। এনফিল্ড বন্দুকের কার্তুজ মুখে কেটে বন্দুকে ভরতে হতো। এই সময় এক গুজব প্রচারিত হয় যে, এই কার্তুজগুলোতে গরু ও শুকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। স্বভাবতই এই প্রচার হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মীয় সংস্কারে তীব্র আঘাত করে। সমগ্র দেশে ঝটিকা গতিতে অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ২৯ মার্চ, ১৮৫৭ খ্রি. ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদন্ডে দন্ডিত করে বিদ্রোহ দমন করতে চেষ্টা করা হয়।

বিদ্রোহের বিস্তার ও দমন

সিপাহীদের বিদ্রোহ ব্যারাকপুর থেকে দিল্লিতে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লিতে মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা দেয়। অতপর ক্রমে ফিরোজপুর, মুজাফফরনগর, পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, মোরাদাবাদ, আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, ফতেপুর, ফতেহগড়, বাংলা, বিহার প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহ বিস্তৃতি লাভ করে। স্থানে স্থানে কিছু কিছু জনসাধারণ, সম্পত্তিচ্যুত তালুকদার, নির্যাতিত কৃষক এই বিদ্রোহে যোগদান করে।কানপুরের নানাসাহেব, তাঁতিয়া তোপী, আজিম উল্লাহ, জগদীশপুরের রাজপুত দলপতি কুনওয়ার সিং, ফৈজাবাদের মৌলভী আহমদ উল্লাহ, ঝাঁসির রাণী এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ইংরেজরা চরম নৃশংসতার মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করে। মাত্র চার মাস যুদ্ধ করে ইংরেজগণ দিল্লি পুনরুদ্ধার করে; বৃটিশ শাসক বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে যুদ্ধ অপরাধী বলে দক্ষিণ বার্মার মান্দালয়ে নির্বাসিত করে। তিনি সেখানে ১৮৬২ খ্রি. ৮৭ বৎসর বয়সে মারা যান।

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ

সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা যে অনিবার্য তা প্রথম থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সর্বপ্রথম উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিদ্রোহের কোন সুচিন্তিত পরিকল্পনা ছিল না। বিদ্রোহের প্রারম্ভ সম্বন্ধে কোন স্থিরতা ছিল না। বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহীদের সংবাদ প্রেরণের কোন সংগঠন ছিল না।প্রকৃত সংহতি ছাড়াই কোম্পানির ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে এই মহাবিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে। ফলে একযোগে এবং একই সময়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ শুরু হলে ব্রিটিশ শক্তির যে সমূহ বিপদ ঘটতো তা হয়নি। অভ্যুত্থানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে যোগাযোগের অভাব দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে চলেন। এর ফলে এই বিদ্রোহ পরিকল্পনাবিহীন বিচ্ছিন্ন বিক্ষোভে পরিণত হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পাটনা শহরকে কেন্দ্র করে ওয়াহাবিদের যে অভ্যুত্থান আরম্ভ হয়, তার সঙ্গে গয়া এবং শাহবাদে কুনওয়ার সিংহের নেতৃত্বে যে অভ্যুত্থান ঘটে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। বিদ্রোহীদের মধ্যে সম্পর্ক থাকলে ইংরেজদের পক্ষে কলিকাতা থেকে উত্তর ভারতে সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ পাঠানোর ব্যবস্থা

বিকল করে দেওয়া দুরূহ ছিল না। অধিকতর দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের মধ্যে স্বার্থের বিরোধ বজায় থেকে গিয়েছিল। ফলে যে ধরনের সহযোগিতা সাফল্যকে সুনিশ্চিত করতে পারতো তা আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পার্থক্যের জন্যে তিরোহিত হয়ে যায়। বহুধা বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ কখনও সাফল্য অর্জনের উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়নি। ফলে ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে সুসংহত পরিকল্পনার দ্বারা বিদ্রোহ দমন করা সহজসাধ্য হয়।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ কূটনীতির গভীর চাতুর্য ও প্রায় অপ্রত্যাশিত সাফল্যও বিদ্রোহের ব্যর্থতার অপর এক প্রধান কারণ। ইংরেজগণ কূটনীতির আশ্রয় নিয়ে তদানীন্তন দেশীয় রাজ্যগুলোর অধিকাংশ রাজাদের তাদের পক্ষে ধরে রাখতে সক্ষম হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ছলেবলে ও কৌশলে পাঞ্জাব অধিকার করা সত্ত্বেও ইংরেজগণ শিখদের সমর্থন লাভ করে। শিখ, গুর্খা, রাজপুত এই যুদ্ধ বিশারদ তিন গোষ্ঠীর সমর্থন লাভ না করলে ইংরেজদের পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হতো না। লর্ড ক্যানিং মন্তব্য করেন, "সিন্ধিয়া যদি বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দেন তাহলে কালই আমাকে জিনিসপত্র নিয়ে এদেশ ত্যাগ করতে হবে।" কাশ্মিরের মহারাজা গুলাব সিং সম্পর্কে জেনারেল লরেন্স বলেন যে, "১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে আমাদের অবস্থা যে অনেকটা মহারাজার দয়ার ওপর নির্ভর করেছিল, তা বললে অত্যুক্তি হবে না।" প্রকৃতপক্ষে আফগানিস্তানের আমীর দোস্ত মহম্মদ থেকে শিখ, গুর্খা ও রাজপুত সৈন্য এবং সিন্ধিয়া, হোলকার ও হায়দ্রাদের নিজাম প্রমুখদের সাহায্য ভিন্ন ইংরেজ সৈন্যধ্যক্ষদের প্রতিভা ও ধৈর্য বিদ্রোহকে প্রশমিত করতে পারতো না।

তৃতীয়ত, যুদ্ধ ক্ষমতা ও সংগঠনের দিক থেকে শাসকপক্ষ বিদ্রোহীদের অপেক্ষা বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ ছিল। অস্ত্রশস্ত্রের প্রাচুর্য, সামরিক দক্ষতা, শৃঙ্খলা, সেনাপতির সংহত পরিচালনা, রেল ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা প্রচলনের কল্যাণে ইংরেজদের সাফল্য প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। অন্যদিকে বিদ্রোহীদের পক্ষে সাহস ও উদ্দীপনার অভাব ছিল না, কিন্তু কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অভাবে অভ্যুত্থান প্রথমাবস্থা থেকে 'স্বত:স্ফূর্ত উচ্ছৃঙ্খলায়' পরিণত হয়। অভ্যুত্থানের মূলে বিদেশী শাসনের যন্ত্রণাবোধ থাকলেও তাকে সংগঠিত রূপ দেওয়া সম্ভবপর হয়নি। যে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা উদ্দীপনার শিহরণ সারা দেশে সঞ্চারিত করে তা ক্রমশ লুপ্ত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী সিপাহীদের মধ্যে একটি বোধ স্পষ্ট ছিল যে, পরাজয়ের শাস্তি হল নির্মম অত্যাচার ও ভয়াবহ মৃত্যু। এই কারণে তারা প্রায়ই অকারণ নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করায় জনসাধারণের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। সিপাহীদের অর্থাভাব ও গোলাগুলির অভাবও তাদের পঙ্গু করে দিয়েছিল।

চতুর্থত উল্লেখ করা যায় যে, সামগ্রিকভাবে ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে ব্যাপক বা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেনি। যে সামগ্রিক গণবিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনকে অবলুপ্ত করতে পারতো সেই ব্যাপক রূপ এই বিদ্রোহ ধারণ করতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই বিদ্রোহের মধ্যে কোন শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত খুঁজে পায়নি। তারা এই বিদ্রোহকে সামন্ততান্ত্রিক এবং রক্ষণশীল শক্তির প্রতিরোধ সংগ্রাম বলে অভিহিত করেন। ইংরেজ শাসনকে তাঁরা সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ বলে মনে করেন এবং ভারতের উন্নতির জন্য এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার জন্য ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্ব কামনা করেন।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ লরেন্স ভ্রাতৃদ্বয়, নিকলসন, আউট্রাম, হ্যভলক, এডওয়ার্ড প্রভৃতির নিপুণ দক্ষতা, অবিচল ধৈর্য্য এবং অসম সাহসিকতা ব্রিটিশ শাসকদের সাফল্য সুনিশ্চিত করেছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ

সিপাহী বিদ্রোহের চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানা বিতর্ক ও মতান্তর রয়েছে। বিভিন্ন অভিমতের সমন্বয় সাধন করে এ পর্যন্ত সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজও সম্ভবপর হয়নি এবং কখনও হবে কিনা বলা দুরূহ। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যতীত প্রায় সকল ঐতিহাসিক বা লেখকই এই বিদ্রোহকে সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপক বিদ্রোহ আখ্যা দিতে সম্মত হননি। বিদ্রোহ দমনের অন্যতম নায়ক স্যার

জন লরেন্স অভিমত পোষণ করেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ মূলত সামরিক বিদ্রোহ এবং চর্বি-মিশ্রিত কার্তুজের প্রচলন থেকেই এর উৎপত্তি। টমসন ও গ্যারাট একে রাজ্যচ্যুত রাজা ও জমিদারদের রাজ্য ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা বা নিছক একটি সামরিক বিদ্রোহ বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ এই বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক দামোদর আভারকর এই বিদ্রোহকে ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন। সম্প্রতি ভারতীয় দুই প্রধান ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন এই বিদ্রোহের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।তাঁদের মতে, সামরিক বাহিনীতে আলোড়নের মধ্য দিয়ে এই অভ্যুত্থানের সূচনা হয়। অভ্যুত্থানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনতার সমর্থন লাভ করলেও এটিকে জাতীয় বিদ্রোহ বলা কোনক্রমেই সঙ্গত বা ইতিহাসনিষ্ট নয়।

কয়েকটি ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় সকল ঐতিহাসিক এবং লেখকদের মধ্যে মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিম বিহার থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত যে ভূখন্ডে অধিকাংশ বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বিদ্রোহ প্রায় সর্বত্র জনসমর্থন লাভ করেছিল। স্বয়ং গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং সরকারি বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, অযোধ্যার এই বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে এক জাতীয় অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করেছিল। ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন উল্লেখ করেন যে, হিন্দু-মুসলিম সৌভ্রাত্র এই অভ্যুত্থানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং বিদ্রোহের সর্বস্তরে হিন্দু এবং মুসলমানের অংশগ্রহণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল। ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করেন যে, জনসাধারণের স্তর থেকেই বিদ্রোহীরা তাদের দল বৃদ্ধি করেছিল। এই বক্তব্যের সমর্থনে অনেকে ঐ সময়ে উত্তর ভারতের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে 'চাপাটি' (রুটি) চালানোর ঘটনার কথা উল্লেখ করে থাকেন। তাঁরা একে মহা বিদ্রোহের নীরব পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বিদ্রোহের সময় বাংলায় এর কোন প্রভাব পড়েনি একথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানেও অসন্তোষের অভাব ছিল না এবং ব্রিটিশ পক্ষের পরাজয়ের সংবাদে সকলেই পুলকিত হয়ে উঠতো। শিক্ষিত জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে যে ক্ষোভ ছিল তা পাদ্রী আলেকজান্ডার ডাফ-এর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি মন্তব্য করেন, "অনেকে ইংরেজ শাসনের অনুকূলে থাকলেও তারা ঐ শাসনের প্রতি অনুরক্ত বললে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে।"

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এই বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, এর কোন একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল না। এটি ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। তিনি এই অভিমত দেন যে, "The outbreak 1857 was not mutiny growing out of a national revolt or forming part of it, but primarily a mutiny gradually developing into a general revolt in three certain areas." তাঁর মতে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ মূলত ছিল সিপাহীদের বিদ্রোহ, কোথাও সিপাহীদের পশ্চাতে ছিল স্থানীয় জমিদার বা অভিজাত শ্রেণীর প্রতিনিধিগণ। আবার কোথাও ছিল জনসাধারণের সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় সহানুভূতি, যদিও জনসাধারণের সমর্থন কোন অবস্থাতেই জনবিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করেনি। ড. মজুমদার এই কথাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সেই সকল শ্রেণীই সিপাহীদের বিদ্রোহে যোগদান করেছিল যাঁদের স্বার্থ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ক্ষুন্ন করেছিল। যেমন বিদ্রোহের নেতৃবর্গ (মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, ঝাঁসির রাণী), অযোধ্যার জমিদার, তালুকদার ও প্রজারা। সে কারণে দেশীয় রাজন্যবর্গের এক বিরাট অংশ এবং জনসাধারণের বিপুল অংশ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেনি। উপরন্তু তারা ব্রিটিশ পক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেও ত্রুটি করেনি।

অপরদিকে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন মন্তব্য করেন যে, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের আন্দোলন সিপাহীদের বিদ্রোহরূপেই আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু সর্বত্র এই বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অযোধ্যা ও শাহাবাদ ভিন্ন অন্যত্র বিদ্রোহীদের প্রতি জনসাধারণের সমর্থন এমন কিছু ছিল না যার দ্বারা একে জাতীয় সংগ্রামের পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে। এছাড়া ড. সেন মন্তব্য করেছেন যে, যে সকল অঞ্চলে জনসাধারণের সমর্থন ছিল সে সকল অঞ্চলের বিদ্রোহী নেতাদের লক্ষ্য ছিল প্রতি বিপ্লব ঘটানো।

প্রকৃতপক্ষে, জাতীয় অভ্যুত্থান বলতে যা বুঝায় তা ১৮৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনাবলীর মধ্যে পুরোপুরি দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা তার উপযোগী বাস্তব পরিস্থিতি তখনও সৃষ্টি হয়নি। প্রকৃত জাতীয় আন্দোলনের আবির্ভাব সে যুগে সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকায় হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন, "গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা থেকে দেখা গিয়েছে যে, ভারতীয় প্রজাদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুকূল্য একান্ত স্বপ্ন। শুধু সিপাহীদের নয় সারা দেশেই যেন বিদ্রোহ ঘটছে। ...সিপাহীদের সাম্প্রতিক বিদ্রোহগুলো সম্পর্কে বলা যায়, প্রথম থেকেই দেশের সহানুভূতি তারা আকর্ষণ করতে পেরেছে। এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে তার গুরুভার অনুভব করছে না। বস্তুত, এই অসন্তোষ বিদেশী শক্তির অধীন হয়ে থাকার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।"

কোন বিদ্রোহে বেশির ভাগ জনগণ অংশগ্রহণ করে না। সংখ্যা লঘুরাই বিদ্রোহ বা বিপ্লব শুরু করে। নিরস্ত্র জনগণের পক্ষে কাতারে কাতারে বিদ্রোহে যোগ দেয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অধিকাংশ ভারতবাসী মনে মনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কামনা করেছিল। বিদ্রোহী সিপাহীরা যদি আর একটু সতর্ক ও সংযত হতো তবে তারা অনেক বেশি জনসমর্থন পেতো। এদিক দিয়ে বিচার করলে ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহ বলাই সঙ্গত।

অভ্যুত্থানের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিতর্ক থাকা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতবর্ষের জনমানসে এই বিদ্রোহের তাৎপর্য অসাধারণ। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, পরবর্তীকালে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে এই বিদ্রোহের স্মৃতি যে আবেগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা বিনা সংশয়ে গ্রহণ করা যায়।

সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল

সিপাহী বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে স্যার লেপেন গ্রিফিন মন্তব্য করেছেন, "The revolt of 1857 swept the Indian sky clear of many clouds." প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্রোহের ফলে বহু অনিশ্চয়তার অবসান এবং ভারতের শাসন ব্যবস্থার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল।

মহাবিদ্রোহ ভারতের রাষ্ট্র পরিচালকদের শাসননীতির ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ইংরেজ শাসকগণ এ যাবত অনুসৃত শাসননীতির মৌলিক ব্যর্থতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে এগিয়ে আসেন। কোম্পানির ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ভারতের জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনা করে ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষ ভারতের শাসনভার একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে রাখতে স্বীকৃত হলেন না। ফলে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২ আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আইন পাশ করে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনভার ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করে। ফলে ভারতে ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়। বোর্ড অব কন্ট্রোলের পরিবর্তে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়। তিনি ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন– এরূপ সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি নামে পরিচিত হন। 'গভর্নর জেনারেল' লর্ড ক্যানিং প্রথম 'ভাইসরয়' বা রাজপ্রতিনিধি পদে নিযুক্ত হন। এই ক্ষমতা হস্তান্তর করাকে কানিংহাম 'বাস্তব পরিবর্তন অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক মাত্র' বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৮৪ খ্রি. পিটের ভারত আইন লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকে ভারত সম্পর্কিত সকল ক্ষমতা বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপতির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিল এবং ডাইরেক্টর সভার ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহুক্ষেত্রে হ্রাস করা হয়েছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলোর আনুগত্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং একে চিরস্থায়িত্ব প্রদানের আশায় লর্ড ডালহৌসি প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয় এবং দেশের চিরাচরিত রীতিগুলোকে লঙ্ঘন করা হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। দেশীয় রাজাদের এই বলে আশ্বাস দেয়া হয় যে, ব্রিটিশ সরকার আর রাজ্য বিস্তার করবেন

না। তাদের সঙ্গে যেসব সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেগুলো বলবৎ থাকবে এবং সকল বিষয়ে তাদের অধিকার ও মান মর্যাদা রক্ষা করা হবে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের অভ্যুত্থান সংঘটনে ব্রিটিশ শাসকদের প্রবর্তিত কয়েকটি সংস্কারের দায়িত্ব রয়েছে মনে করে বিদ্রোহের পর থেকে কর্তৃপক্ষ সমাজ সংস্কার বিষয়ে সতর্ক হয়। ভারতের সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করবেন না বলে আশ্বাস দেয়া হয়।

মহারাণীর ঘোষণাপত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, একমাত্র ব্রিটিশ নাগরিক ও প্রজাদের হত্যাকান্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন অপর সকলকে শাস্তিদান থেকে নিষ্কৃতি দেয়া হবে এবং জাতিধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতানুযায়ী ভারতবাসীকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করা হবে। ঘোষণাপত্রের এই আশ্বাস বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য ১৮৬১ খ্রি. ভারতীয় সিভিল সার্ভিস আইন পাশ করা হয়।

ভারতীয় সামরিক বিভাগ পুনর্গঠিত করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে সিপাহীদের ভূমিকা প্রধান ছিল বিবেচনা করে 'ভাগ কর এবং শাসন কর' নীতি (Divide and rule) অবলম্বন করে প্রেসিডেন্সি সেনাবাহিনীকে পৃথক করে রাখা হয়, ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হয়, গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় এবং সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের ওপর অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত কয়েকটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে বেশি সংখ্যায় সৈন্য নিয়োগ করা শুরু হয়।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয়করণ নীতি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের কাউন্সিল আইন দ্বারা পরিত্যক্ত হয় এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রত্যর্পিত হয়।এই নতুন কাউন্সিল আইন দ্বারা ভারতের নতুন আইনসভা গঠিত হয়। নতুন আইন সভায় পাতিয়ালার মহারাজা, বেনারসের রাজা ও স্যার দীনকর রাওকে বেসরকারি সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

বিদ্রোহের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসন দেয়া হয় এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্রগণকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। '১৮৭৬ খ্রি. রাজনকীয় অধিকার' আইন ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে 'ভারত সম্রাজ্ঞী' আখ্যা দেয়া হয়। এইভাবে ইতিহাস খ্যাত মুঘল বংশের অবসান ঘটে।

বিদ্রোহ দমনের পর ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসে। হিন্দুগণ পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে আধুনিকতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানগণ তীব্র ইংরেজ বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা সর্বোতভাবে বর্জন করে পিছিয়ে পড়তে থাকে।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহে যেমন একটি যুগের পরিসমাপ্তি তেমনই একটি নতুন যুগের আবির্ভাবের সুযোগ হয়। ব্রিটিশ শাসকগণ তখন থেকে ভারতের অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করা অপেক্ষা অর্থনৈতিক শোষণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে থাকেন। ভারতের সামন্ততান্ত্রিক শক্তির নিকট থেকে যে বিরোধিতার আশঙ্কা এতদিন পর্যন্ত ছিল তার অবসান হয়। তখন থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে এক নতুন আন্দোলনের সম্মুখীন হতে হয়। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ। নব উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রথম পর্যায়ে বৃটিশ সরকারের চরিত্র পরিবর্তন করে তাকে ভারতের স্বার্থের উপযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়।

সারসংক্ষেপ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বিগত একশত বৎসরে ঔপনিবেশিক ইংরেজ সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও অনুসৃত নীতির প্রতি ভারতীয় জনগণের চরম অসন্তোষের ফল। রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শাসন সংক্রান্ত এবং অর্থনৈতিক, সামরিক কারণে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন তথা শোষণ, বঞ্চনা থেকে মুক্তি পাবার আশায় সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভিতকে কঠোরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বৃটিশদের কূটকৌশল, সিপাহীদের সুষ্ঠু সামরিক সংগঠন, পরিকল্পনাহীন বিদ্রোহ ও অস্ত্র-শস্ত্রের অভাব এবং ইংরেজদের সামরিক সংগঠনের দক্ষতা, সর্বোপরি জনগণের স্বত:স্ফূর্ত সমর্থনের অভাবে এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়। বিপ্লবের ফলস্বরূপ ভারতে কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। ভারতের শাসনভার সরাসরি বৃটেনের রাণীর অধিকারে চলে যায়। পার্লামেন্টে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত কাউন্সিল ভারতের শাসনভার পরিচালনা করবে। এসঙ্গে স্বত্ববিলোপ নীতির বিলুপ্তি ঘোষণা, ইউরোপীয় সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি, ভারতীয়দের উচ্চ রাজপদে নিয়োগ দান প্রভৃতি সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়। ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। রতন লাল চক্রবর্তী, *সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ*, ঢাকা।

২। এ.কে.এম. আবদুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল কত খ্রিস্টাব্দে?

(ক) ১৭৫৭ খ্রি. (খ) ১৮৫৭ খ্রি.

(গ) ১৭৬৪ খ্রি. (ঘ) ১৮২৭ খ্রি.।

২। কি কারণে লর্ড ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন?

(ক) কুশাসনের অভিযোগ এনে (খ) সুষ্ঠু শাসন পরিচালনার অভিপ্রায়ে

(গ) সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য (ঘ) রাজ কর্মচারীদের অভিযোগের কারণে।

৩। 'General Services Enlistment Act' কে প্রবর্তন করেছিলেন?

(খ) লর্ড ডালহৌসি (খ) লর্ড ক্যানিং

(গ) লর্ড ওয়েলসলি (ঘ) লর্ড কর্নওয়ালিস।

৪। সর্বপ্রথম কার নেতৃত্বে সিপাহীরা বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রি.) ঘোষণা করেছিলেন?

(ক) মঙ্গল পান্ডে (খ) অসীম পান্ডে

(দ) সুসল পান্ডে (ঘ) অমল পান্ডে।

৫। কতজন সদস্য নিয়ে ভারত শাসনের জন্য কাউন্সিল গঠিত হয়?

(ক) ২০ (খ) ১০

(গ) ১৫ (ঘ) ২৫।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সিপাহী বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণের ওপর একটি টীকা লিখুন।

২। সিপাহী বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ চিহ্নিত করুন।
৩। সিপাহী বিদ্রোহের সামরিক কারণসমূহ উল্লেখ করুন।
৪। পরিকল্পনাহীন বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ– স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করুন।
২। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ উল্লেখপূর্বক এর ব্যর্থতার কারণ বর্ণনা করুন।
৩। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের বিস্তার ও দমনের বিশেষ উল্লেখপূর্বক এর ফলাফল বর্ণনা করুন।

নৈর্ব্যক্তি প্রশ্নের উত্তরঃ

পাঠ-১ ঃ ১। (গ); ২। (খ); ৩। (খ); ৪। (ক)।
পাঠ-২ ঃ ১। (গ); ২। (ঘ); ৩। (ক); ৪। (ক); ৫। (খ)।
পাঠ-৩ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (গ); ৪। (ঘ); ৫। (গ)।
পাঠ-৪ ঃ ১। (গ); ২। (ঘ); ৩। (ক)।
পাঠ-৫ ঃ ১। (খ); ২। (গ); ৩। (ক)।
পাঠ-৬ ঃ ১। (ঘ); ২। (খ); ৩। (ক)।
পাঠ-৭ ঃ ১। (খ); ২। (ক); ৩। (খ); ৪। (ক); ৫। (গ)।